অনিরুদ্ধ

পুলকেশ দে সরকার

প্রকাশক—পুলকেশ দে সরকার
৩১।সি।১৫ হরিনাথ দে রোড
কলিকাতা—৯
অক্টোবর ১৯৫৯

মূল্য—চার টাকা মাত্র

মুদ্রাকর—
শ্রীজয়গোবিন্দ পাল
যোগমায়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১, রাজেন্দ্র দেব রোড; কলিকাতা-৭

এর পরের বই

মনে পড়ে

লেখকের অন্যান্য বই

বালির প্রাসাদ (উপন্যাস)

লেডী রম্ (শ্লেষাত্মক গল্পগুচ্ছ)

আচরণবাদ (মনস্তত্ত্ব)

ফাঁসীর আশীর্বাদ (স্বাদেশিক)

ভাষাভিত্তিক পশ্চিমবঙ্গ

বাংলার নয়, সভ্যতার সঙ্কট

বুদ্ধ, রবি, অনিমা, সমীরণ, বাবুল, নারায়ণ,

নান্টু, কেষ্ট, হারু, কৃষ্ণা, তরুণ,

রুবি, শিবাজী, শিউলি,

বরুণ, বাপ্পা, বেবী

ও

রা হু ল

একটি গল্প বলি শোনো —

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ সম্পাদিত
"সোনার বাংলায়" ১৯৩৮ সালের
অক্টোবর হইতে ১৯৩৯ সালের
ফেব্রুয়ারী অবধি ধারাবাহিক প্রকাশিত।
অন্তরীণাবস্থায় লেখার সময় ও
স্থান ১৯৩৫, বংশীহারি, দিনাজপুর।
তৎকালীন রচনাভঙ্গি সম্পূর্ণ সংরক্ষিত।

অনিরুদ্ধ

বিচ্ছুরিত কাঁসার থালাখানি ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া উঠিল।

আরও যাহারা খাইতে বসিয়াছিল তাহারা চমকিত হইয়া দেখিল, প্রতুল ভাতের থালাখানি ভাত-তরকারী-সহ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহারই দিকে তাকাইয়া ফোঁপাইতেছে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। আবার যে যাহার খাবারের দিকে মন দিল।

যিনি পরিবেশন করিতেছিলেন তিনি ছুটিয়া আসিলেন; পতিত থালাখানির ঝন্‌ঝনানি থামিয়া যাইতে না যাইতেই প্রতুলের পিঠে গোটা কয়েক ঘা দিয়া বলিলেন, হতভাগা!

সৎমা। সৎমা না হইলেই কি? সহ্য করিবার আপন মায়েরও একটা সীমা থাকে। যতবার খাওয়ার সময় হইবে প্রতুলের গোলযোগ লাগিয়াই আছে। কেবল কি খাওয়া? কী বিষয় লইয়া যে এই একরত্তি ছেলেটা কোন্দল না করিবে, তাহার হদিস বাড়ীর লোকে পায় না। শুধু তাহাই নহে, এই স্পর্দ্ধিত ছেলেটা ক্রোধ প্রকাশের এমনই বিরক্তিকর উপায় গ্রহণ করে যে, কেহই অন্ততঃ সেই মুহূর্ত্তটার জন্য চঞ্চল না হইয়া পারে না। বাড়ীর লোকেরা জানে, কারণ-কার্য্যরূপে দুইটি ঘটনা পরপর ঘটিবেই। একটি প্রতুলের অহেতুক বিরূপতা, দ্বিতীয়টি সৎমার বে-হিসাবী বেত্র-শাসন। তাই অন্যান্য ভোজনকারীরা প্রতুলের ব্যবহারে ক্ষণিকের জন্য চটিয়া থাকিলেও সৎমা'র পরের কার্য্যটায় মনে মনে অন্ততঃ 'আহা' না করিয়া পারিল না।

বড়দা চিরকালই কম কথার মানুষ, কিন্তু তেমনি কোমল। শাসিত শিশুর দিকে তাকাইয়া লজ্জায় ও সঙ্কোচে নিজের ভাতের দিকে নজর দিলেন বটে, ইহার পরে একগ্রাস ভাতও তাঁহার গলা দিয়া নামিতে চাহিল না। অথচ এমনি রোজই।

হঠাৎ কানে আসিল প্রতুল বলিতেছে, এই এক লেচকি বেগুন ভাজা দিয়েছে!

সৎমা ধাই করিয়া ধমক দিয়া উঠিলেন, ফের!

বড়দা কোনমতে বলিয়া ফেলিলেন, এই—পুতু—বেগুন তো খেয়ে ফেলেছি, মাছখানা নিবি?

প্রতুল কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, না—ভাজা।

তেমনি জেদি ছেলে। বলিয়া সৎমা ভঙ্গী করিয়া ফিরিতেছিলেন।

এই বাড়ীতে এই মুখরার জবাব দেন এক মেজদা। এই নারীটির উপর মেজদার যেন একটা বিজাতীয় ক্রোধ ছিল। বাবার ভীরুতার জন্য কিছুই করিয়া উঠা যাইত না সত্য, কিন্তু তিনি কোন কালেই পরাজিত তো মনে করেনই নাই, উপরন্তু এই একছত্র সম্রাজ্ঞীর উপর দুইটা শক্ত কথা বলিতে পারিলেই যেন তৃপ্তি বোধ করিতেন। কিন্তু তাহাতেও মাঝে মাঝে সংযম আনিতে হইত। নতুবা কনিষ্ঠ অপোগণ্ডগুলির দুর্দ্দশার আর অবধি থাকিত না।

বড়দার পরেই মেজদার পিঁড়ি, তিনি বলিলেন, আপনিও তো কম যান না।

সৎমাকে ফিরিতে হইল, ঝাঁঝাঁলো গলায় উচ্চারিত হইল, কিসে?

সেই কখোন্ থেকে বেগুন বেগুন করছে—

করুক, তাই ব'লে ঐ এক ফোঁটার জেদ রাখতে হবে?

রাখছেন আর কই, কিন্তু জেদ লোকে এক ফোঁটারই রাখে।

না, কক্ষনো না, হাবাতের খোরাক আমি জুটিয়ে উঠতে পারব

না।—তারপর প্রতুলের দিকে সরোষে তাকাইয়া বলিলেন, থাম্‌লি ? এই রাক্কোস—চুপ !

প্রতুল চুপ যখন করিলই না, তখন আর এক প্রস্থ মাতৃশাসন প্রতুলের উপর দিয়া হইয়া গেল।

বড়দা আগেই উঠিয়া পড়িয়াছিলেন, মেজদা উঠিতে উঠিতে বলিলেন, এ মার একদিন আপনার গায়ে বাজবে।

কী ?

হ্যাঁ, বলিয়া মেজদা কলতলায় চলিয়া গেলেন।

দেবীকান্ত সর্ব্বপ্রথমে যখন শ্যামনগরে বাস আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার বয়স কুড়িও পার হয় নাই। কিন্তু ঐ অল্প বয়সেই বিক্রমপুরে নিজ পিতার কাঠের কারবার যখন তিন সহোদর মিলিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়াছিলেন, তখন বিদেশে চেষ্টা করা ছাড়া আর কি-ই বা উপায় থাকিবে ? কিন্তু এইবার আর অকৃতকার্য্যতা নহে, পরিপূর্ণ সফলতা দেখা দিতে লাগিল।

হাতের লেখা অপাঠ্য ছিল, লেখাপড়াতেও এমন একটা কেউ-কেটা ছিলেন না, ইংরেজী তো জানিতেনই না, বাংলার জ্ঞান চলনসই রকমের ছিল। কিন্তু মুসাবিদায় তাঁহার নাকি পাকা হাত ছিল। আর তখন ঐ বাংলার উত্তর খণ্ডে আজিকার মত এত জনসমাগমও ছিল না।

দেবীকান্ত সেটেলমেণ্টের কাজে হাত পাকাইয়া ফেলিলেন, বুদ্ধিও পাকিয়া উঠিল। দেবীকান্ত টর্নিগিরি সুরু করিলেন।

সেকালে শ্যামনগরে স্থানীয় পরীক্ষা দিয়া তৎস্থানীয় মোক্তার ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিল হওয়া যাইত। দেবীকান্ত মোক্তার হইলেন ; দেবীকান্ত উকিল হইলেন। সে ব্যবসায় এমনই গুছাইয়া তুলিলেন যে, হাতের কাঁচা পয়সা খরচের জন্য খচখচ করিত, যৌবনও তখন পুষ্ট হইয়া উচ্ছ্বলিত হইতে চাহিতেছিল। ফলে যাহা হইবার হইল। গ্লাস আসিল, গ্লাসের ফেনায় নারীর নগ্নদেহও ফুটিয়া উঠিল। কিছুদিন

এই ক্ষেনীয়মান বিলাস হইতে দেবীকান্তকে খুঁজিয়া বাহির করা দায় হইল। সেকালে এই বস্তু দুইটি ভদ্রসমাজে একেবারে নিন্দনীয়ও ছিল না।

কিন্তু যে-বিষয়-বুদ্ধি দেবীকান্তকে অতি নগণ্য টর্নি হইতে সিভিল কোর্টের উকিলে পরিণত করিয়াছিল, তাহাই তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিল। এই প্রকার সংসার-ভোগের অর্থ-গলতিটা যে খুবই বেশী, এই তত্ত্ব যেদিন তাঁহার কাছে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, সেদিনই তিনি নিজের এই উদ্দাম রিপুর রাশ টানিলেন; অবসর করিয়া দেশের বাড়ীতে গিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই মুন্সীগঞ্জের সন্নিকটে এক গ্রামের গুহ বংশের পঙ্কজিনীকে সহধর্ম্মিণী করিয়া কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। পঙ্কজিনীর পিতা ধনী ছিলেন না। একেবারে গরীবও ছিলেন না, কিন্তু সদ্বংশজাত ছিলেন এবং সেই সুনাম আপন পুত্রকন্যায় হস্তান্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পঙ্কজিনী দৃঢ় হাতে একদিকে যেমন দেবীকান্তকে সর্ব্বপ্রকার অপব্যবহার হইতে টানিয়া আনিলেন, অন্যদিকে সেবা-শুশ্রূষায় ভালবাসায় তাঁহাকে মোহিত করিয়া ফেলিলেন। দেবীকান্তের যৌবন-উচ্ছৃঙ্খলার দুইটি জিনিস টি'কিয়া গেল। একটি তামাক, দ্বিতীয়টি পাশা। বুদ্ধিমতী পঙ্কজিনী এই দুইটি থাকিতে দিলেন। নিরুৎসাহ না হইয়া এবং অন্য নেশা ছাড়িয়া দেবীকান্ত তামাকের পরিমাণটা এতই বাড়াইয়া দিলেন যে, কাঠের ফাঁক-কাটা একটি কল্কির সেল্‌ফ আসিল, আর আসিল একটি অতিরিক্ত ভৃত্য।

পঙ্কজিনী হাসিয়া বলিতেন, তামাকের ক্ষেত আর কুমোরের চাক শেষে না রাখতে হ'লে বাঁচি।

দেবীকান্ত হাসির চোটে নলটা ফেলিয়া দিয়া বলিতেন, ঐটুকু অতীতের স্মৃতি, থাক।

পঙ্কজিনী মনে মনে বলিতেন, থাক, ঐটুকুই তো, কিন্তু তবুও বলিতেন, পাশাটারও কি এমনি নেশা নাকি?

দেবীকান্ত শুধু বলিতেন, যদি বুঝতে।

প্রত্যুত্তরে পঙ্কজিনী মুচকি হাসিয়া কঞ্চির অবস্থাটা দেখিয়া বলিতেন, ওটার কিছু আছে, না, অযোধ্যাকে ডাকব?

ইহার পরে কাহারো পক্ষে গম্ভীর থাকা সম্ভবপর হইত না।

এমনি করিয়া একদিন মহা সোরগোলে, চিন্তা, উদ্বেগ, ও আনন্দের মাঝে পঙ্কজিনী দেবীকান্তের জেষ্ঠ্যপুত্রকে পৃথিবীতে পরিচিত করিতে আনিলেন; আদর, হৈ-হুল্লোড়ে "সভ্যের" বৃদ্ধি ঘটিবার আড়াই বছর না যাইতেই দ্বিতীয় পুত্র দেখা দিল; তার দুই বৎসর পর তৃতীয়টি। দেবীকান্তের সৌভাগ্যে কেহ ঈর্ষা, কেহ আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতর করিল।

দেবীকান্তের সহোদর জ্যেষ্ঠের কোন সন্তান ছিল না; পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহেরও ইচ্ছা ছিল না, অন্ততঃ বর্ত্তমান স্ত্রী যতদিন-না গত হন। কিন্তু এই পুণ্যবতী বা সমর্থা স্ত্রীর অতীত হইবার আশু কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

ওদিকে পঙ্কজিনী দেবীকান্তকে নির্ব্বিঘ্নে তৃতীয় উপহার দিলেন। প্রসূতি আঁতুর ঘর হইতে বাহির না হইতেই এ-বাড়ীতে একখানা চিঠি আসিল। চিঠির মর্ম্ম এই যে, সদ্যোজাত শিশুটির পিতৃমাতৃদায় স্থানান্তরিত করা যায় কি-না। দেবীকান্তের জ্যেষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু আপন সন্তান দত্তক দিবার কথায় মনটা খানিকটা বিরূপ না হইয়াই পারিল না।

কাছারী হইতে ফিরিবার পর, সুস্থ অবস্থায় ঠাকুর জলখাবার দিয়া গেলে এবং ব্যবহৃত বাসনাদি চাকর উঠাইয়া লইয়া গেলে পত্রাদি পড়ার অভ্যাস দেবীকান্তের একপ্রকার বরাবরের। বরাবর অর্থে পঙ্কজিনী যেদিন হইতে গৃহশৃঙ্খলার ভার লইয়াছিলেন।

আজও সেইভাবেই চিঠিখানা হাতে পড়িল। বারান্দায় জলচৌকিতে দেবীকান্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলেন। উঠানে এই সবেমাত্র আর দুইটা ছেলে কোলাহল করিয়া খেলিয়া গিয়াছে;

এবং এইমাত্র অযোধ্যার তত্ত্বাবধানে সান্ধ্য-হাওয়া খাইতে গিয়াছে। উঁহাদের উপস্থিতি এখনও যায় নাই। উঠানে কাপড় টাঙাইবার জন্য একটা মোটা তার আড়াআড়ি টানা ছিল; মাঝে একটা বাঁশ; মেজ ছেলেটা ঐটি ধরিয়া ঝুঁকাইতেছিল, তারটির দোলন ও কাঁপন এখনো যায় নাই। বড়টা বড় ঠাণ্ডা, বড় বেশী ঠাণ্ডা, অতিরিক্ত রকমে গম্ভীর; মেজটা তেমনি হৈ-হুল্লোড় লইয়া আছে। বড়টা বছর পাঁচেকের হইতে চলিল, মেজটার কত হইবে? আড়াই? না. এখনো আড়াই হয় নাই, দুই বছরের একটু বেশী। কিন্তু বেশ চালাক, টপাটপ বুঝিয়া ফেলে।

ঠাকুর!

মা।

তোমার বাবু কি বেরিয়ে গেছেন?

কেন গো? বলিয়া সচকিত দেবীকান্ত স্বয়ং প্রসূতির ঘরের কাছে আসিলেন, ঠিক ঘরে নয়, দাওয়ার বাইরে। দেবীকান্ত-দম্পতি প্রেমিক; কিন্তু সেইকালের লোক, ছুৎমার্গ না মানিয়া উপায় নাই।

পঙ্কজিনী ছেলে-কোলে বসিয়াছিলেন, বলিলেন, ভাবলাম তুমি বেরিয়ে গেলে।

দেবীকান্ত অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বলিলেন, নাঃ, আজ আর যাব না ভাবছি।

পঙ্কজিনী হাসিয়া বলিলেন, সেকি, পাশা যে তোমার নেশা! কিন্তু না-যাবার কি হ'য়েছে বলতো?

দেবীকান্ত উড়াইয়া দিবার জন্য বলিলেন, কিছুই তো হয়নি।

পঙ্কজিনী ছেলেটার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, হয়েছে, বলবে না। আমি জানি, তোমার ভারী কষ্ট হ'চ্ছে।

দেবীকান্ত চমকাইয়া উঠিলেন, বলিলেন, কিসের?

পঙ্কজিনী রক্তমুখ ও সলজ্জ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, ঠাকুর-

চাকর দিয়ে কাজ, যেমনটি ক'রে বলি, তেমনটি ওরা দিতে পারে? কী ছাই-পাশ যে রাঁধে।

দেবীকান্ত আশ্বস্ত হইলেন, কেননা প্রসূতিঘরে থাকাকালীন সময়টুকু ছাড়া পঙ্কজিনী নিয়মিত অভ্যাসমতো চিঠিগুলি যথাসম্ভব পড়িয়া রাখিয়া স্বামীর বৈকালিক জলখাবার সাজাইয়া দিয়া পাখাহাতে বলিতে সুরু করিতেন, 'ওগো অমুকে যে এই এই লিখেছে,' 'জান, বাবা কি লিখেছেন?' 'এমনি হাসি পায় বড়দির কথা শুনে'....ইত্যাদি ইত্যাদি। দেবীকান্তও বক্তব্যের উপসংহার পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিতেন; পঙ্কজিনী তখন বলিতেন, খেয়ে নাও, দেখবে'খন। ক্ষণিক বিহ্বলতায় দেবীকান্ত স্থান-কাল ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, পঙ্কজিনী সর্ব্বনাশের সকল কথাই জানিয়াছেন। তাই প্রথমটায় চমকাইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর ঔদার্য্যে আশ্বস্তই শুধু হইলেন না, অত্যন্ত খুসী হইলেন। তাড়াতাড়ি বলিলেন, ক্ষেপেছ? তবে, হাঁ, রাঁধুনের বাড়ীটা বিক্রমপুর নয় বটে।

আঁতুর ঘর হইতে অনিবার্য্য ধমক আসিল, যাঃও, যেন সেখানকার সবাই অন্নপূর্ণা।

দেবীকান্ত বলিলেন, তা' বটে, কিন্তু দেখেছো ঐ বাচ্চাটা হাত-পা ছুঁড়ে কি রকম বিক্রম দেখাচ্ছে? বেটাকে নোব নাকি একটু কোলে?

পঙ্কজিনী খুসী চাপিতে চাপিতে বলিলেন, সত্যি, সতু আর জিতুর চাইতে—

খুব নাদুস-নুদুস না?

ছি! বলতে নেই।

বাঃ তুমি যে বলছিলে....

চুপ! দেখ হাসছে।

হাসছে নাকি? কই দেখি···

রোস—রোস—একেবারে তর সয়না তোমার, এটা আঁতুর ঘর, সন্ধ্যে বেলাটা....

অপ্রতিভ দেবীকান্ত পিছাইয়া গেলেন। আর ছেলেটা নাড়া-চাড়ায় কাঁদিয়া উঠিল।

নিজের অপ্রতিভতা কাটাইতে দেবীকান্ত বলিয়া উঠিলেন, উঃ ব্যাটার কি সার্গম-ভাজা গলা!

পঙ্কজিনী এই দুষ্ট বিদ্রোহীর ব্যবহারে নিরাশ হইয়াছিলেন, শিশুর মুখে মাই লাগাইয়া বলিলেন, যাও তো তুমি পাশা খেলতে, তোমায় ও মোটে দেখতে চায় না।

কথাটা রহস্য করিয়া বলা। যে-লজ্জার ভারটা লঘু করিয়া দিবার জন্য পঙ্কজিনীর এই কথার অবতারণা, আর একজনের প্রাণে এযে কি নিদারুণ আঘাত দিতে পারে, গোধুলি-কালের আবছায়ায় তাহা পঙ্কজিনীর চোখে পড়িল না, তিনি শিশুর পরিচর্য্যায় স্তন্যপান লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেবীকান্ত পাণ্ডুর মুখে অতিকষ্টে হাসি টানিয়া বলিলেন, দুষ্টু ছেলে! আচ্ছা, চলি তবে।

পঙ্কজিনী বলিলেন, রাত কোরো না যেন, অযোধ্যাকে শিগগির বাতি দিয়ে পাঠাবো, কিন্তু লাঠিটা নিও হাতে।

কথাটা আপাততঃ চাপা পড়িল বটে, কিন্তু চিরকাল তো এরূপ থাকিতে পারেনা? পোষ্টাফিস মারফৎ আর একখানা চিঠি আসিল এবং এইবার নিয়মক্রমে পঙ্কজিনীর হাতে পড়িল, কেননা তিনি ততদিনে 'পবিত্র' হইয়াছেন।

"কল্যাণবরেষু—"

তারপর আর যাহা থাকিতে হয় তাহাই ছিল। অভাগ্যের এক প্রস্থ বিবরণ। হতভাগিনীর নিত্য-পিয়াসী ক্রন্দন। সম্ভাবনার ঘর শূন্য। ইহকাল অথর্ব্ব, পরকাল অন্ধকার। পুন্নাম-নরকের ভীতি। তারপর ভগবানের একরোখা বিচার। তারপর দেবীকান্তের প্রশংসা। তারপর কাতর ক্রন্দন, আবেদন। তারপর···

পত্রখানা হাত হইতে পড়িয়া গেল।

শিশু অকাতরে ঘুমাইতেছিল। তাহারই পাশে উষ্ণতর স্পর্শ, কাঁচা কচি মাংসের গন্ধে নাক ডুবাইয়া মা ঘুমাইয়া পড়িলেন। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ!

আবার শব্দ! শিশু জাগিয়া খেলিতেছে, কাঁথা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আর,

"এত অবেলায় ঘুমুচ্ছ?"

কাছারী হইতে আসিয়া দেবীকান্তের একবার পঙ্কজিনীর সহিত দেখা হওয়া চাই-ই। পঙ্কজিনী ভীষণ লজ্জিত হইলেন। প্রথমটা কিযে বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

দেবীকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, শরীরটা ভাল নেই নাকি? তা' হবেনা? বললে তো আর শুনবে না, নিজের ওপর তোমার এতটুকু যদি····

পঙ্কজিনী অতিষ্ঠ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ওগো থাম, কে বলেছে তোমায় আমার শরীর খারাপ হয়েছে? আন্দাজে হৈ হল্লা করা তোমার অভ্যাস।

যাক বাঁচা গেল, এটা কি আজকের নাকি, হ্যাঁ আজকেরই তো বটে, তা মাটিতে ফেলেছে কে, ঐ জিতুটা···

আর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। ততক্ষণ চিঠির অনেকটাই দেখা হইয়া গিয়াছে এবং ইহার ভিতর কি বস্তু থাকিতে পারে জানা হইয়া গিয়াছে।

স্বামীর এই অবস্থা-দর্শনে চোখের জল রোধ করা যখন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল, তখন পঙ্কজিনী ক্লেদাক্ত-শিশুকে পরিষ্কৃত করিয়া বলিলেন, বসো তো জুতোর ফিতেটা খুলে দি।

ঐ সামান্য কাজটুকুও যখন শেষ হইয়া গেল, তখন অনাবশ্যক-ভাবেই বলিয়া উঠিলেন, হাত মুখ ধোবার জল-টল ঠিক আছে তো সব? ও অযোধ্যা!

তিনি জানিতেন, এই সকলের ত্রুটী হইবার জো নাই। জানিতেন, নির্দ্দেশমত জলখাবার তৈয়ারী হইবেই ; তবুও যে-ব্যথাটা সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়া কণ্ঠের কাছে, চোখের কাছে, নাক ও বুকের আশে-পাশে অতিরিক্ত রকমে টনটন করিতেছিল, তাহাকে নিষ্কৃতি দিবার একটি মাত্র উপায় ছিল ; কিন্তু পঙ্কজিনী জানিতেন যে, তরলতায় পথ পিচ্ছিল করিলে দেবীকান্ত একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িবেন ; তাই স্রোত-পথ কঠিন ও অবরুদ্ধ করিতে এই ছলনার খোঁজাখুঁজিটুকু ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

কথাটা উঠিবেই।

উঠিবেই তো, কিন্তু সেটা কিভাবে ফাটিয়া পড়িবে, তাহাই ভাবনার বিষয় ছিল। দেবীকান্তকে অনেকটা জোর করিয়াই খাইতে হইল ; পঙ্কজিনীকে অনেকটা জোর করিয়াই খাওয়াইতে হইল। সে এক সঙ্কট মুহূর্ত্ত যখন একই দুশ্চিন্তা দুইজনের ভিতরেই ফেনাইয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। কথা বলিতে গেলে যদি ধরা-গলা বাহির হইয়া আসে, সেজন্য উভয়েই কথাটাকে এড়াইয়া যাইতেছিলেন। না বলাটাও অশোভন দেখাইতেছিল। কিন্তু কোনটা ভারী, তাহা যেন কেহই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। উভয়েই ভাবিতেছিলেন, ওঁর পক্ষে এ দুঃসহ।

তবু বলিতে হইল।

'এ তুমি সইতে পারবে না, জানি',....পঙ্কজিনী বলিতেছিলেন।

দেবীকান্ত রুখিয়া বলিয়া উঠিলেন, আর তুমি ?

পঙ্কজিনী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, যে যাবেই, তার জন্য............

দেবীকান্তের কাঠিন্য কমে নাই : যাবেই মানে ? এ আমি কিছুতেই হতে দোব না।

পঙ্কজিনীর সমস্ত বুক কাঁপিতেছিল। বলিলেন, ছেলে নিয়ে দুদিকে টানাটানি, এযে বড় অমঙ্গল !

সে আমার ছেলে, টানাটানি করবার কেউ নেই। বলিয়া দেবীকান্ত সরোষে কাঁসার গ্লাসটায় হাত ডুবাইয়া দিয়া তাহারই ধারে ধারে হাত ঘষিতে লাগিলেন।

পঙ্কজিনী বলিলেন, ছি! ওকী করছ, নাও, উঠে সাবান দাও হাতে, বলিয়া নিজেই উঠিলেন।

দেবীকান্ত খানিকটা অপ্রতিভ হইয়া সুরটা নামাইলেন বটে, নালিশের উত্তাপ থাকিয়াই গেল। বলিলেন, জন্মদাতার দাবী-দাওয়া খেলো জিনিস নয়, ও আমি হতে দোব না।

পঙ্কজিনী হাসিয়া বলিলেন, ও উকিলি বুদ্ধি। কিন্তু জন্মদাতার বা পারিবারিক দাবী-দাওয়াটা যদি টিক্‌সই হোত—। সে কথা থাক, ওকে তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।

আক্রোশটা যে শেষটায় ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারই জ্যেষ্ঠের উপর আসিয়া পড়িতেছিল, দেবীকান্ত উষ্ণতার ফাঁকে ফাঁকে তাহা বুঝিতেছিলেন; তাই এইবারে একেবারেই চেতনা ফিরিয়া পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, তা' বটে তা' বটে।

পঙ্কজিনী বিপরীত দিকে পা বাড়াইতে বাড়াইতে বলিলেন, অভাবকে ধমক দিয়ে পূরণ করা যায় না, তা তো তুমি জান।

দেবীকান্ত কথাটা বুঝিতে পারিলেন না।

পঙ্কজিনী ফিরিলেন না। যাইতে যাইতে তেমনই সুরে বলিলেন, দিদির কথা বলছি, বুকের হাহাকার তাঁর কি দিয়ে মিটবে, বল তো?

তা'হলে—

কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ করিয়া এই বক্তব্য, দেবীকান্ত চাহিয়া দেখিলেন, তিনি রান্নাঘরের ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন। কারণ পঙ্কজিনী প্রশ্নও করেন নাই, জবাবও দেন নাই, কেবল নিজের মনকে বুঝাইতেছিলেন। কিন্তু সে বুঝি শুধু বুঝানোই, নহিলে চোখের জল বুঝ্‌ মানে না কেন?

তৃতীয়টি দত্তক হইয়া গেল।

পঙ্কজিনী কাঁদিলেন, দেবীকান্ত চোখ মুছিলেন। কিন্তু একে অন্যের অশ্রুর খবর মনে-মনেই জানিলেন, কেহই খোলাখুলি এই অমঙ্গল কাণ্ডটা প্রকাশ করিয়া নিজেকে আরেক জনের কাছে দুর্ব্বল বলিয়া পরিচয় দিতে চাহিলেন না।

ছেলেটিকে লইয়া যাইবার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত জোর করিয়া দুই জনেই এক প্রকার শক্ত ছিলেন। যাইবার আগের রাতটায় যে এই দুজনের কাহারও ঘুম হয় নাই, কেবল এইটুকু চাপা গেল না।

পঙ্কজিনীর একেবারে পাশেই একটি দীর্ঘশ্বাস অত্যন্ত গভীর হইয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে নির্গত হইল। একেবারে পাশে, পাশের খাটটিতে; যেখানে একা দেবীকান্ত শুইতেন। পঙ্কজিনী সচকিত হইয়া উঠিলেন এবং কনুইয়ের উপর ভর দিয়া ঘরের প্রদীপের স্বল্পালোকে জানিলেন, ছেলে দুইটি ঘুমাইতেছে। তখন রাত কয়টা পঙ্কজিনী জানিতেন না। তিনি মশারীর বাহিরে আসিলেন এবং তাঁহার কোমল হাতখানি অনিবার্য্যভাবে দেবীকান্তের মাথায় রাখিলেন। দেবীকান্ত যেন ইহারই অপেক্ষা করিতেছিলেন, হাতখানি নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে টানিয়া লইলেন।

বিবাহের প্রথম উষ্ণতা আজিও যায় নাই, একেবারে সম্পূর্ণ তেমনই আছে।

উভয়েই বুঝিলেন, কাহার ব্যথা কোথায়?

পঙ্কজিনী যথাসম্ভব সংযত হইয়া অন্যহাতে দেবীকান্তের মাথা হাত পা বুলাইতে লাগিলেন। নিজের চোখের এক ফোঁটা জল ঠোঁট পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া যাইবার ঠিক মুহূর্ত্তটীতে দেবীকান্তের চোখের পাতা ভিজা ঠেকিল।

পঙ্কজিনী আর্দ্র ও ভাঙা গলায় বলিলেন, ছি!

দেবীকান্তের নাকটা জ্বলিয়া উঠিল ও বার কয়েক থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পঙ্কজিনী সর্ব্ব শরীর দিয়া অনুভব করিলেন ; নিজের হাতটায় নিবিড়তর আকর্ষণ বোধ করিলেন।

পঙ্কজিনী ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলেন, ছি!

দেবীকান্তকে পঙ্কজিনীর বড় অসহায় মনে হইল। মশারীর মধ্যে ঐ নিদ্রিত শিশু দুইটির চাইতেও বেশী নিঃসহায় মনে হইল।

পঙ্কজিনীকে দেবীকান্তের ভারী নিরুপায় বোধ হইল। লজ্জাবনতা প্রথম বধূটির মত নিদারুণ করুণ মনে হইল।

উভয়ে উভয়কে সান্ত্বনা দিতে চান।

পঙ্কজিনী দেবীকান্তকে সান্ত্বনা দিতে তাঁহার বুকে মুখ গুঁজিয়া কি জানিলেন বুঝা গেল না ; দেবীকান্ত একটা পরম তরল স্রোত বুকের উপর অনুভব করিলেন।

একে অপরকে অসহায় শিশুর মত কাছে টানিয়া লইলেন।

তৃতীয় ছেলেটি আজ কয়দিন অন্য একঘরে তাহার ভাবী মা ও বাবার মাঝখানে শুইয়া কাটাইতেছিল ; এই পরিবর্ত্তন ঐ অবোধ ছেলেটি কতখানি উপলব্ধি করিয়াছিল, সে-ই জানে, কিন্তু ইহাঁদের উভয়ের ঘন দীর্ঘশ্বাস যেন কথাচ্ছলে বলিতেছিল, বড় কষ্ট, বড় ব্যথা, মা-হারা হইয়া সন্তান কবে সুখে থাকে? যে প্রতিবাদ করিতে জানে না, তাহার কোন নালিশ নাই, একথা সংসারে আর যে-ই বলুক, পিতা-মাতা বলে কি করিয়া, বা অপরের হাতে তুলিয়া দেয় কি করিয়া?

জনপ্রবাদের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া দেবীকান্তের সংসারে ঘি ঢালিতে তিন পুত্রের পর এক ঝি' দেখা দিল। পর বছরেই। পঙ্কজিনীর শূন্য কোল পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু সংসারে ঘি ঢালিয়া দিয়া এই প্রথম কন্যাটি বৎসরান্তেই সংসার ছাড়িয়া গেল।

আবার এক ঝলক কান্নাকাটি, বৈরাগ্য, হা-হুতাশ, জীবনের নশ্বরতা, মায়াময় সংসারের অর্থহীন আকর্ষণ-তথ্যের কপচানি।

তৃতীয় বৎসর চতুর্থ বা পঞ্চম সন্তান—দ্বিতীয়া বা জ্যেষ্ঠা কন্যা। নাম হইল হৈম, কিন্তু 'শ্যামলী' হইলেই ভাল হইত। গায়ের রঙশুদ্ধ পঙ্কজিনীর ছাপ একেবারে।

তারপর ষষ্ঠ সন্তান—ষষ্ঠী—কন্যা, শ্যামলী নম্বর দুই।

সপ্তমী বাপের রঙ পাইল।

ইহার পর পঙ্কজিনী আর কন্যারত্ন বা চিন্তয়সী প্রসব করেন নাই। ইহার পরের দুইটিই ছেলে।

সর্ব্বশেষটি পঙ্কজিনীর অবশিষ্ট রক্তটুকু চুষিয়া লইয়া যেদিন মাতৃহারা হইল, সেদিন দেবীকান্তের হু'স হইল, তাঁহাকে পুন্নাম-নরক হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য তাঁহার সতী সাধ্বী পঙ্কজিনী নাম্নীয় স্ত্রী কী অসম্ভব হাড়-ভাঙা খাটুনিই না খাটিয়া গিয়াছেন। সংসারের গোড়াতে যাহাকে লইয়া একে আর একে দুই হয়, তাহাকেই ফাঁড়িয়া চিরিয়া এই ছোট্ট জায়গাটি যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন সে অনাবশ্যক বলিয়াই যেন মিলাইয়া গেল।

প্রতুলের বয়স তখন এগারো মাস।

দেবীকান্তের সংসারে তখন চারিটি পুত্র, তিনটি কন্যা, দেবীকান্তের এক বিধবা বোন, দুই মুহুরী। হ্যাঁ, দেবীকান্তের তখন ঘি এর অনটন নাই বটে। এমন সোনার সংসার যাঁহার স্তন্যে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি নিজেকে সেই পুঞ্জীভূত ভোগ হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেলেন; কারণ, সংসারে দেহ বস্তুটার উপর দেহতাত্ত্বিকদের খাঁচা বলিয়া যত অবজ্ঞাই থাকুক, সেটির সম্পদে দেউলিয়া হইয়া গেলে মনের বাসনা কামনা মর্টগেজে দেওয়া ভারাক্রান্ত বাড়ীটার মত বাধ্য হইয়াই পরিত্যাগ করিতে হয়।

দেবীকান্তকে কেবল এইটুকু কৃতিত্ব না দিলেই নয় যে, দেবীকান্ত তৎকালীন সকলপ্রকার সম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে অর্থের

সিন্ধুক খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, যদিও প্রসব ব্যাপারে, ভালবাসার আতিশয্য সত্ত্বেও, মেয়েদের আয়ুর ডিগ্রি কী পরিমাণে নামিয়া আসে তাহা একেবারেই জানা ছিল না। ভালবাসার একটি অতি বড় অংশ যে দেহভোগ, আর তাহার পরিণতি যে এমনই দুর্ম্মদ, সে খবর দেবীকান্তকে কেহ জোগাইয়া দেয় নাই, নিজ অভিজ্ঞতায় সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু জানিলেই কি তাহা এড়ানো যায়? সতী-সাধ্বীও এই উত্তেজনার মুহূর্ত্তগুলিকে কোনদিন অন্যপথে বহাইয়া দিতে পারেন নাই, বরং ইহাকেই, অর্থাৎ এই ভীষণতায় আত্মসমর্পণ করাকেই কর্ত্তব্য বলিয়া জানিয়া গিয়াছেন। সংসারে কাহারও সম্বন্ধে তাঁহার নালিশ ছিল না; স্বামীকে সকল প্রকারে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত করিয়া রাখাই ছিল তাঁহার একমাত্র ব্রত। সুরুচির বুকনি যাঁহারা ঝাড়েন, তাঁহারা এই তত্ত্বটুকু ভুলিয়া যান, জন্মমৃত্যুকে রহস্যময় বলিয়া কুয়াসার আবডালে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে মুহূর্ত্তের উন্মাদনার পরিণতিটুকুও চাপা পড়িয়া যায়, যাহার ফলে ভগবান বা অদৃষ্টের ঘাড়ে সকল কিছু চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে বিপত্তি বাড়াইয়া তুলিবার পথ পিচ্ছিল হয়। মৃত্যুর কথা থাকুক, ভীরুদের দেশে উহা লইয়া কম চোখের জল ফেলা হয় নাই; কিন্তু যেদেশে অশ্লীল কথা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অনায়াসে নির্লজ্জের মত বলা চলে, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা বলিয়া যাহারা হাটেবাজারে উদোম ন্যাংটা হইয়া নাচিতে সরম বোধ করেনা, সেদেশে জন্মের হেতু লইয়া আলোচনা করিতে গেলেই পণ্ডিতেরা রাজদ্বার পর্য্যন্ত ছুটিয়া যান; যেদেশে শ্লীলতার ধারণা পর্য্যন্ত জন্মাইতে পায় না, সেদেশে জন্মরহস্য কে বুঝিবে?

দেবীকান্ত তো অসাধারণ ব্যক্তি নহেন। পঙ্কজিনীও নহেন। সমাজের অজ্ঞতার কাছে পঙ্কজিনীর এই রক্তমোক্ষণ একটা নির্ব্বাক প্রতিবাদ বলিয়াই তুচ্ছ ও অবহেলার; তাই বলিয়া দেবীকান্ত কী করিবেন?

তিনি আর পাঁচজনের মত কাঁদিলেন, অভিমান করিলেন, উপবাস করিলেন। কচি পাঁঠার প্রতি যাঁহার প্রবল আসক্তি, তিনি যেদিন প্রচার করিলেন, তিনি আমরণ নিরামিষাশী থাকিবেন এবং সত্য-সত্যই কাহার স্মৃতি-ধ্যানে নির্জন ঘরে বহুক্ষণ কাটাইয়া দিতে লাগিলেন, তখন বাড়ীর পিসিমা প্রমাদ গণিলেন; কেননা, মৃতা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এইরূপ অনবদ্য ভক্তি বিধবা নারীর কাছে বাড়াবাড়ি না ঠেকিয়াই পারে না।

দেবীকান্তের শুইবার ঘরের দরজা যখন খুলিল এবং ঘরের চাপা আলোটার রেখাগুলি যখন উঠানে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তখন বেশী রাত হয় নাই; কিন্তু সর্ব্বকনিষ্ঠ মা-হারা সন্তানটি লইয়া যিনি তাঁহারই অপেক্ষায় বারান্দায় বসিয়াছিলেন, তিনি আজ ইহার নিকাশের জন্য খানিকটা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন।

এমন ক'রে শরীরটা যে শেষ ক'রে ফেলছ, দাদা?

এ অনুযোগ একপ্রকার নিত্যকার। তাই দেবীকান্ত কথার খেইটা সুরুতেই ধরিতে পারিতেন। এখন এইমাত্র যাঁহার ধ্যান করিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন, তাঁহার জন্য যত বৈরাগ্যই হইয়া থাকুক, স্মৃতিগুলি সংসারের ছোটোখাটো তুচ্ছ কথা লইয়াই; তাহাদের সূত্র ধরিয়া যেমন বৈরাগ্যের ফাঁকা জায়গায় পৌঁছানো যায়, সেই একই সূত্র ধরিয়া তেমনি সংসারের কোলাহলে নামিয়া আসিতে হয়; বৈরাগ্যের তাড়নায় সংসার-চিন্তা যতখানি ছাঁটিয়া ফেলিবার প্রয়াস দেখা দেয়, ঠিক ততখানি প্রয়াস লইয়াই সংসার বড় ও সুন্দর হইয়া গজাইয়া উঠে। যাহাকে ছাঁটিতে চেষ্টা, তাহা ফলফুলে ভরিয়া উঠে। সেই মূর্ত্তিটি বিলীন তো হয়ই না, বরং কাটিয়া কাটিয়া বসিতে চায়। ইহাকে না পারা যায় গ্রহণ করিতে, না পারা যায় ঝাড়িয়া ফেলিতে। দেবীকান্ত ভাবিয়াই

পান না, এই স্মৃতির ব্যথাই তাঁহাকে পোহাইতে হইবে অথবা ইহাকে আর কিছু দিয়া ঢাকা দিবেন। ব্যথাও সহে না; স্মৃতিগুলিকে সজাগ ও মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিতেও ইচ্ছা যায়, অর্থাৎ যাহাকে হারাইয়াছি তাহাকে পরিপূর্ণরূপে পাইতে চাই। কিন্তু একেবারে ঢাকিয়া দেওয়া? দেবীকান্ত ভাবিতেও পারেন না।

আর স্মৃতিই যে কি ভীষণ আকারে দেখা দিতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই প্রতীক্ষারতা নারীটি, তাহারই কোলে পঙ্কজিনীর শেষ উপহারটি। ইহারাও স্মৃতি, শুধুমাত্র চিন্তায় যাহাদের শেষ অস্তিত্ব নহে, যাহাদের অবিরত দাবী প্রতিদিন কায়িক পরিশ্রমে দেবীকান্তকে বিপর্য্যস্ত না করিয়াই পারে না। ইহাদের নাড়িয়া-চাড়িয়া আরাম, না, ইহারা যাঁহাকে সূত্র করিয়া আসিয়াছে তাঁহাকে ভাবিতে আনন্দ, দেবীকান্ত তাহার সঠিক হদিস পান না। সংসারের বাহ্যিক কর্ম্মক্রিয়া তাঁহারই সহোদরা সন্তানহীনা হেমাঙ্গিনী স্বহস্তে ও স্বেচ্ছায় অনাহূত ভাবেই তুলিয়া লইয়াছেন বলিয়া দেবীকান্তকে অনুতাপ করিতে হয় না সত্য, কিন্তু সংসারে আপন বলিয়া যেন সব কিছুই চুকিয়া গিয়াছে। প্রতুলকে হেমাঙ্গিনী প্রাণ দিয়াই ভালবাসিতেন; আর আর ছেলেগুলির তাঁহারই তত্ত্বাবধানে কোন নালিশের ফাঁক থাকে না ইহাও সত্যি; কিন্তু তবুও যেন কিছুই নাই। তিনি বুঝিতে পারেন না, যৌবনের সেই কাহাকে যেন চাই ভাবটাই তাঁহাকে নিয়ত উত্তেজিত করে, না, বার্দ্ধক্যের কাহাকে যেন হারাইয়াছির দীর্ঘশ্বাসটাই ঝাড়া দিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলে?

হেমাঙ্গিনীকে তিনি শুধু সহ্য করিতেন না, ছোট বোন হইলেও খানিকটা কৃতজ্ঞতা তাঁহার প্রতি দেবীকান্তের হৃদয়ে জমা হইয়াছিল; আর বোন হিসাবে স্নেহ নামে ঘনিষ্ঠ আকর্ষণটা তো ছিলই। হেমাঙ্গিনীর আবদারে-ভর্ৎসনা তাই কোনদিন তাঁহার কাছে বাসি ও অরুচির ঠেকিত না।

দেবীকান্ত তৎকালীন স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের উপর হাসি টানিয়া বলিলেন, কেন, আমি তো বেশ আছি, হেমা?

হাঁ, আছ বৈ কি। কদ্দিন হ'য়ে গেল আরসিমুখো তো হও না।

দেবীকান্ত হাসিলেন, ইহার কি জবাব দিবেন?

হেমাঙ্গিনী বলিতে লাগিলেন, এইগুলোকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে একজন তো অক্ষয়-স্বর্গ বেছে নিলেন, কিন্তু আমি এই বোঝা বইব ব'লেই কি এসেছি, দাদা?

এতো তোর বোঝা নয়, হেমা।

আর তা' যে কত হাল্কা তাই ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবে ব'লে নিজেকে ক্ষইয়ে দিচ্ছ, নয়?

দূর পাগলি। বলিয়া দেবীকান্ত হাসিলেন।

তবে?

দেবীকান্ত জবাব দিলেন না।

তোমরা ঢের জান, দাদা, হেমাঙ্গিনী বলিতেছিলেন, কিন্তু এইটে আমায় বুঝিয়ে দিতে পার, এতে তোমরা কী লাভ পাও?

কিসে রে? দেবীকান্ত উৎসুক হইলেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, একজন না হয় বিদেয় হ'লেন। তাঁর কর্ত্তব্য আমার ওপর যে দিয়ে যাননি, এ তুমিও জান; কিন্তু বৌদি যে তোমাকে সে দায় থেকে খালাস দেন নি, এ এত সহজে কি ক'রে ভোল, দাদা?

দেবীকান্ত ব্যথিত হইলেন। কিন্তু কিছু বলিলেন না।

হেমাঙ্গিনী একটু থামিয়া বলিলেন, অন্ততঃ, এরা তাঁর স্মৃতি ব'লেও তোমার অবহেলা করা উচিত নয়।

দেবীকান্ত সহিতে পারিলেন না. বলিলেন, অবহেলা কি সত্যই করি, হেমা?

তোমার বিবাগী-মন এছাড়া কী করতে পারে?

দেবীকান্তের ভিতরে আবার একটা তোলাপাড়া সুরু হইল।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কিছুই বলা যায় না, আমার যদি একটা ভাল মন্দ....

দেবীকান্ত রুখিয়া বলিলেন, জানিস ও-কথায় আমি ব্যথা পাই ?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, যাঁর কথা এইমাত্র তুমি ভাবছ, দাদা, তিনি যে আরো ব্যথা দিয়েছেন।

কথাটা এত ভীষণ সত্য যে, দেবীকান্ত চমৎকৃত হইলেন।

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিলেন, আর ব্যথা পেলেই যদি তা' এড়ানো যেত ! জানি, বেঁচে থাকতে হবে ব'লেই বিধবা হ'য়েছি ! তোমার কল্যাণে দুঃখ নেই সত্যি, কিন্তু আমি যে মানুষ, দাদা ; দেউলে হ'য়ে বাঁচবার সাধও থাকতে পারে না, আয়ুষ্মতী হ'য়ে চিরকাল বাঁচতেও পারব না।

দেবীকান্ত রূঢ়ভাবে বলিয়া উঠিলেন : তোকে বাঁচতেই হবে, হেমা।

হেমাঙ্গিনী তেমনি শান্তভাবে বলিলেন, এ যে ভয়ানক অসঙ্গত দাবী।

হোক, দেবীকান্ত বলিলেন।

না, এ-ভার নিজ হাতে নাও।

দেবীকান্ত অসহায়ের মত বলিলেন, এত যে একা সইতে পারব না, হেমা।

তবে এদের বিসর্জ্জন দেবে, হেলাফেলা করবে ?

তা-ও পারব না।

তোমার শরীর দিন দিন পঙ্গু ক'রে ফেলবে এ-ও আমি দেখতে পারব না।

শরীর তো আমার খারাপ হয় নি, হেমা, বেশ তো আছি।

বেশ-ই আছ। তুমি দাদা, তোমায় কি বলব !

একবার হুকুম করতে পারিসনে, হেমা ?···

কোলের ছেলেটিকে সন্ত্রস্তে সামলাইয়া তাড়াতাড়ি দেবীকান্তের

পা’ দুইটা ছুঁইয়া হেমাঙ্গিনী বলিয়া উঠিলেন, ছি দাদা, তুমি যে শ্রদ্ধেয়।

দেবীকান্ত বিমূঢ় ও মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনী মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, মেয়ে মানুষের এ মুখে আনতে নেই। বিশেষ আমি সন্তানহীনা, বিধবা, সমাজে কোন শুভ কাজেই আমি লাগব না, নইলে বলতাম…

দেবীকান্ত অত্যন্ত আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলতিস, হেমা?

অন্ধকারে তেমনিই মুখ ফিরাইয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বলতাম—তুমি ফের বিয়ে করো।

একটি অস্ফুট আওয়াজ হইল। কথাটা বলিয়া ফেলিয়া হেমাঙ্গিনীর কানেও তেমন ভাল শোনায় নাই, তাই তিনি চমকিয়া যখন এদিকে মুখ ফিরাইলেন, দেখিলেন, দেবীকান্ত সেখানে নাই।

লজ্জিতা ও বিক্ষুব্ধা হেমাঙ্গিনী অন্ধকারের আবছায়ায় সিঁড়ি বাহিয়া প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন। উঠান পার হইয়া যাইতে চোখে পড়িল বাঁদিকে একটা ঘরে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করিতেছে; কেবল দুই একটিকে বই লইয়া থাকিতে দেখা যাইতেছে। ইহাদের শাসন করিবার কেহই একপ্রকার নাই। হেমাঙ্গিনীই ইহাদের একমাত্র অভিভাবিকা; আর জন্মের হিসাবে যাহারা আগে আসিয়াছে তাহারা তাহাদের পরবর্তীদের উপর চড়টা চাপড়টার শাসনাধিকার নিজেরাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। প্রতুলের সম্পর্কে না আসিলে হেমাঙ্গিনী বড়-একটা বকাঝকা করেন না। প্রতুলের অংশে পিসিমার অযাচিত অনুগ্রহ পুরোপুরি তো জোটেই, বাঁটা অংশে প্রতুল যদি আবদার করে, তবে সকল সভ্যকেই খানিকটা ট্যাক্সো দিতে হয়—নতুবা কাঁদিয়া সে যে অনর্থ বাঁধাইত, তাহা পিসিমার কেন, কাহারও সহ্য হইত না। এ অভ্যাস পিসিমাই করাইয়াছেন। শিশুকে নির্ব্বোধ বলিয়া যাঁহারা উড়াইয়া দেন,

তাঁহাদের এইটুকু খবর দিবার প্রয়োজন যে, পিসিমার বাঁটিবার পদ্ধতি হইতে প্রতুল নির্বিবচারে আপনার সর্ব্বাগ্রগণ্য ও শ্রেষ্ঠ দাবী আহরণ করিয়াছিল এবং ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরিয়া লইয়াছিল,অনটন তাহার হইতে পারে না; বরঞ্চ যতখানি তাহার প্রয়োজন, ততখানি সরবরাহ করাই এই সংসারের নিয়ম। না হইলেই অন্যথা হইল।

'ছোট' বলিয়া কেহ আপত্তি করে নাই, করিলেও পিসিমা তাহা শুনিতেন না, প্রতুল একেবারেই শুনিত না।

এক বছরের প্রতুল পিসিমার কোলে সজাগই ছিল। গোলযোগের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় সেইদিকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে বলিয়া উঠিল, উ-উ। বলিয়া এমন হেলিয়া পড়িল যে, স্পষ্ট বুঝা গেল, ঐ গোলমালে এমন একটা কিছু ঘটিতেছে যাহা হইতে বঞ্চিত হইতে সে মোটেই রাজী নহে। পিসিমা নরম ছোট হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, ঠাকুর যাবিনে?

ঠাকুর অর্থ রান্নাঘর। রান্নাঘর যে কী অপূর্ব্ব বস্তু এবং সেখানে কি থাকে, এই রহস্যময় রসভাণ্ডারটির বিতরণকারিটি যে কি চিজ, এই বয়সেই প্রতুলের তাহা ধারণা হইয়াছে। গোলমালে যতখানি বঞ্চনাই থাকুক, পিসিমার নির্দ্দেশিত জায়গায় গেলে বঞ্চনা হইবে না, ইহা সে অবধারিতরূপেই জানিত। জানিত বলিয়া দ্বিরুক্তি করিল না। আগত-নিশ্চিত-ভবিষ্যত কল্পনায় আপনা আপনিই মুখের লালা নিঃসৃত হইয়া পড়িল।

রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া পিসিমা হাঁকিলেন, ঠাকুর!

অনিবার্য্য উত্তর আসিল, মা!

ছেলেগুলো কি খাবেনা নাকি আজ রাতে?

ঠাকুর কড়াইটার দিকে তাকাইয়া বলিল, একটু দেরী হ'য়ে গেল, মা, বাজার আসতে একটু দেরী হ'ল, মাছটা টাটকা-টাট্‌কি....

পিসিমা বলিলেন, লছমন কোথায়? জায়গা টায়গা করতে হবেনা, না কি?

লছমন সেই মুহূর্ত্তেই বাড়ী ঢুকিতেছিল, বলিল, এই এলাম, মা।

লছমনকে বাড়ীতে ঢুকিতে দেখিয়া হেমাঙ্গিনীর কি একটা কথা মনে পড়িল। গলাটা একটু খাটো করিয়া নিকটে আগত লছমনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, বাবুকে বাইরে দেখলি ?

লছমন ভাবিয়াছিল, অসময়ে টাট্টি করিতে গিয়া সে একটা অপরাধ করিয়াছে ; তাই পিসীমার এই নরম সুরে খানিকটা বিস্মিত না হইয়াই পারিল না এবং একটা কিছু বলিতে পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল। বলিল, বাবুতো বাইরেই একলাটি আছেন ; কিন্তু দপ্তর-খানায় তো আলো নেই, মা।

আলো নেই ? কেন, দিসনি ?

লছমন বলিল, বাতি তো সে সাঁঝ বেলাতেই দিয়াছে, কিন্তু কি যে হইল সে বলিতে পারে না, যদি হুকুম হয় একবার দেখিয়া আসিতে পারে।

দেবীকান্ত কেন যে নির্জ্জনতা ও অন্ধকার বাছিয়া লইয়া নিজের একান্ত নিঃসঙ্গ জীবনটা আরও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছেন, তাহা মনে করিয়া হেমাঙ্গিনীর নিজের উপর বিরক্তি বাড়িয়া গেল।

পিসিমা বলিয়া উঠিলেন, না থাক, তুই জায়গা কর্।

কথাটা খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতেই লাগিল।

প্রতুলকে দুধটুকু খাওয়াইয়া উঠিয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রতুলের নজর ঠিক ছিল। এত জিনিস থাকিতে শুধু এই একটিমাত্র সাদা পদার্থ দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবে, ইহা তাহার ভাল লাগিল না। সে ভাতের হাড়ির ঢাক্‌নাটার উপর কি কতকগুলা দেখাইয়া বলিল, উঁ....

পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কি ঠাকুর ?

ঠাকুর হাসিয়া বলিল, বড়দিদিমণি বলেছিলেন, গোটা কয়েক বড়া....

পিসিমা যাইতে যাইতে বলিলেন, ও তাই বলো, ওকি মানুষে খায়···

কিন্তু প্রতুল পরের মুখে ঝাল খাইতে রাজী নহে। নিদারুণ চীৎকার সুরু করিল। পিসিমার কোন-কথাই কানে তুলিলনা। নিরুপায় পিসিমা কহিলেন, কমলা খাবি ?

প্রতুল স্পষ্ট জবাব দিল, না, বলিয়া ভীষণ ঝাঁকিতে লাগিল। পিসিমার সৌভাগ্য, লছমনের আহ্বানে ছেলের মহল হৈ হৈ করিয়া এইবার রান্নাঘরে আসিতে লাগিল। পিসিমা বলিলেন, চেঁচাসনি, ওরা জানবে, কমলা খাবি চ'। ক্ষুদ্র শিশু কি বুঝিয়া চুপ করিয়া গেল।

সেই পিসিমা মারা গেলেন।

একেবারে হঠাৎ বলাও যায় না। বিধবারা ছোট-খাটো রোগ-শোককে অবহেলা করিয়াই চলে। প্রতুলই ছিল তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান। তাহাকে অত্যধিক আদর দিয়া যতই নিজে উত্যক্ত হইতে-ছিলেন, ততই তাঁহার দেহে ও মনে বেদনাপূর্ণ একটা স্নেহ-রস পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। প্রতুলকে কোলে-কাঁখে করিয়া তাঁহার কখনও ব্যথা বোধ হইত না; তাহাকে খাওয়াইয়া বাল-গোপালের সেবা করিতেছি বলিয়া তাঁহার ধারণা হইত। প্রতুলের কোন দাবীই তাঁহার কাছে অসম্ভব মনে হইত না, বরং তাহার প্রত্যেকটি দাবী-ই পূরণ করিতে পারিনা কেন বলিয়া একটা অতৃপ্তি থাকিয়া যাইত।

পরবর্ত্তীকালে মেজদা বলিয়াছিলেন, পিসিমা আর কিছুকাল থাকলেই হয়েছিল আর কি! কোন নেশাই বাদ থাকত না; বাবার গুড়গুড়ির নল নিয়ে যে টানাটানি সুরু করেছিলি!

আর আমার? সেজদা যোগ দিতেন, আমার দুধের সবটুকু কদ্দিন কেড়ে ওকে খাইয়েছেন পিসিমা!

ছোড়দি বলিতেন, তাই আবার না দিলে সবটা ফেলে দিত রাক্ষোসটা।

সেকালে এবং একালে—অজ্ঞান ও জ্ঞানের দুই স্তরেই প্রতুলের মনে পিসিমার কথাটা গাঁথিয়া গিয়াছিল। মা'র কথা তাহার মনেও নাই, থাকিতেও পারে না; আর আশ্চর্য্য, মা'র সহিত তাহার কি সম্পর্ক এই কথা জানাইয়া দিতে কাহারও ব্যগ্রতা ছিল না। মা তো নয়—পিসিমা!

সেই পিসিমা মারা গেলেন।

দেবীকান্ত এত শ্ন ও উত্তরটা দুই হাতে ঠেলিয়া এড়াইয়া চলিতে চাহিয়াছেন, তাহাই আবার ভয়াবহরূপে অত্যাবশ্যক হইয়া দেখা দিল। দেবীকান্তের পুনর্ব্বিবাহের অজুহাত ছিলই, কেবল ইহাকে আড়াল করিয়া অনাবশ্যকের পর্দ্দারূপে যে সহোদরা জুটিয়াছিল তাহাও ছিঁড়িয়া খান্ খান্ হইয়া গেল। দেবীকান্তের স্মৃতিটাই বড়, না, হারানোটাই বড়, পাল্লার ভারীটা কোন দিকে, অন্ততঃ দেবীকান্ত সে খোঁজ জানিতেন না।

বজ্রযোগিনীর সোমপাড়ায় যে আধা-পরিষ্কার পুকুরটা আছে, তাহার পূবের পাড়টায় তিনখানা খড়ের ঘর বিমলাদের বাড়ী। পুকুরে অবিশ্রাম সাঁতার কাটিয়া, চীৎকার করিয়া ঘোলাটে জলের আ-বাঁধানো ঘাটের উপর বিমলা যখন উঠিয়া আসিল, তখন মুরারী একটা আধখাওয়া পেয়ারা চিবাইতে চিবাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, দিদি, শিগগির;—চিঠি এসেছে।

বিমলা খ্যাঁকাইয়া উঠিল, চিঠি এসেছে তো আমার কি রে?

মুরারী তাহার তিন বছরের—তিন বছরের কি? না, চার বছরের ছোট ভাই। বিমলার বয়স পনের উৎরাইয়া যাইতেছে, তবুও বিবাহ হয় নাই, গ্রামে এইটি মস্ত আশ্চর্য! যেন পয়সা

না-থাকাটা মোটেই আশ্চর্য্য নহে, যেন পয়সার সঙ্গে বিবাহ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই, যেন সেই সম্পর্ক সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে সময় কাটিয়া যাইবে না, বিমলারও পনের'র কোঠা ছাপাইয়া যাইবে না।

কালো; হাসিলে কালো মাড়ি বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু অসম্ভব নিটোল স্বাস্থ্য ও মাথার আগোছালো চুল কোমর পর্যন্ত তো লুটাইয়া পড়েই, আরও খানিকটা নাবিয়া যায়।

আর এই পনেরটা বছর পাড়ার অতবড় ধাড়ি ছেলেদের সহিত কোঁদল করিয়া, পাড়া-পড়শীর সহিত ঝগড়া করিয়া কাটিয়াছে। ফলে, অভ্যাসবশতঃ, জিহ্বার ধারটা এতই প্রখর হইয়াছিল যে, পাড়ায় কেন, বিমলাকে ভয় পাইত না এমন মোড়ল তিনখানা গ্রামের মধ্যেও ছিল কিনা সন্দেহ। ছোট একটি মাত্র ভাই, তাই বলিয়া বিমলার আক্রোশের প্রকাশটা ইহার উপর কেহই কম লক্ষ্য করে নাই, বিমলাও একচেটিয়াত্বের দাবীতে প্রত্যহই সে মুরারীর পিঠে কোবলা করিতে ভোলে নাই।

তবুও মুরারীর সে-ই একমাত্র দিদি। বিধবা মা। তার মানে, বাবা নাই। কাজেই বিমলার স্বাধীনতাকে প্রতিহত করিতে কেহই একপ্রকার ছিল না। পুকুরটা তাহাদের নহে, তবুত পুকুরের মালিক ইহার স্বত্ব লইয়া বিমলার মুখোমুখি কোন কথা কহেন নাই; বিমলার খুসী হইলে বিমলার হাতের ছিপখানা পর্য্যন্ত পুকুরে খেলা করিয়াছে; কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। অথচ ইহা লইয়া কেহ যদি কোনদিন ঘুণাক্ষরেও মন্তব্য করিয়াছে এবং বিমলার কানে তাহার তিলমাত্র প্রবেশ করিয়াছে, তবে যে-ই হউক, তাহাকে খানিকটা নাজেহাল হইতে হইত।

বিধবার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না, অথচ বিবাহ দিবার কোন পথই তাঁহার কাছে বিদিত বা সুগম ছিল না। বলিয়া লাভ নাই বলিয়া বিমলাকে কিছু বলা তিনি একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন;

উপরন্তু পাড়ার লোকের নানাপ্রকার অযাচিত উপদেশ ও ভর্ৎসনা শুনিতে হইবে বলিয়া বাড়ীর বাহিরও বড় একটা হইতেন না। সেই কাজ বিমলাই স্বয়ং ষোল আনা কেন, সতের আনা সমাধা করিত এবং বোস-পাড়া ও গুহ-পাড়া প্রভৃতি কোন মনুষ্য-বস্তিই তাহার বাদ পড়িত না।

এককালে লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে মস্তিষ্কের জোর কতখানি লাগে, তাহার হিসাব সম্বন্ধে ধারণা করিবার আগেই ইহা সে নিঃসন্দেহরূপে বুঝিয়াছিল যে, অন্ততঃ বসিয়া থাকিবার ধৈর্য্য ইহাতে লাগে। এই ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে যদি হয় তো সে ছিপ লইয়া, কলাপাতায় রকমারি রেখা টানিয়া নহে; বরং ছিপ লইয়া বসিয়া থাকিবার লাভ এইটুকু যে, অকস্মাৎ একটা মাছ উঠিয়া আসিলেও আসিতে পারে। ইহার সাব্যস্ত মর্ম্ম এই যে, বিমলার পাঠাভ্যাস এক সপ্তাহও পূরিতে পায় নাই, ইহার পুর্ব্বেই সে তাহাতে ক্ষান্তি দিয়াছে।

গরুর খাইবার জন্য একটা কাঠের পাত্র ছিল; তাহাতেই সরঞ্জাম ফেলিতে যাইতেছে দেখিয়া বিধবা হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন: ও কি করছিস, হভভাগি!

বিমলা গ্রাহ্যও করিল না, বলিল, ও ছাই কি মানুষের?

মা অবাক হইয়া বলিলেন, তবে কার?

বিমলা কালো-মাড়ি বাহির করিয়া বলিল, যারটা তাকেই দিলাম।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সর্ব্বনাশি!

কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত।

এ-হেন বিমলা ভ্রাতার সংবাদে নির্ব্বিকার না হইয়া পারে না। বলিল, চিঠি এসেছে তো আমার কি রে?

মুরারী নিরাশ হইয়া বলিল, বারে, মা যে বললেন…

কী বললেন?—প্রশ্নেও তেমনই উষ্মা।

মুরারী বলিয়া ফেলিল, চিঠি এসেছে—হুঁ—তোমার বিয়ে।

বিমলা ঠাস্ করিয়া মুরারীর গালে এক চড় বসাইয়া দিল।

মুরারীর হাতের ও মুখের পেয়ারা ছিটকাইয়া পড়িল। সে প্রথমটায় কাঁদিতেও পারিল না। এত বড় অন্যায় কি করিয়াছে ভাবিয়া বিহ্বল হইল; তাহার পর গালের ব্যথাটা যখন চড় চড় করিয়া উঠিতে লাগিল, তখন আপ্‌নিই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর কম্পিত দেহটা সবেগে টানিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। বিমলা গম্যমান ভ্রাতার পন্থানুসরণ করিয়া নিজের ভিজা কাপড় সামলাইতে সামলাইতে বলিয়া উঠিল: বিয়ে। বিয়ে। তোকে এ-সব ফাজলামোতে কে থাকতে বলেছে, হতভাগা।

ক্রোধের আবেগে মাথা ঝাড়া দিয়া সমস্ত চুলগুলি পিঠে এলাইয়া দিল এবং হাতের গামছা দিয়া সেগুলির উপর সজোরে এমন বাড়ি মারিল যে, জলকণাগুলি কে কাহার আগে ঝরিয়া পড়িবে তাহারও একটা লড়াই অলক্ষ্যে হইয়া গেল।

তারপর বাড়ীর উঠানে পা দিতেই তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই যে মা ভণিতা ছাড়িতেছিলেন, ইহা বুঝা গেল: তোমায় তো ব'লে লাভ নেই, বাছা, হায়রাণ হয়ে গেলাম; ঐ একরত্তি ছেলেটা, সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটি মাত্র ভাই, ওকে এত মারও মারে। একি মানুষের প্রাণ গা? ছিঃ, সোমত্ত মেয়ে, বিয়ে হ'লে ছেলেপুলে সামলাতে হতো, আর তার কিনা দয়া নেই, মায়া নেই, আশ্চর্য্য। মাগো, জ্বলে পুড়ে ম'লাম।

বিমলা ঝাঁঝিয়া উঠিল: অদেষ্টের কাছে মাথা কুট্‌লে না, মা?

মা বলিলেন, অদেষ্টই বটে, নইলে এমন ছিরি আর স্বভাব....

বিমলা বলিল, বাবা কেমন ছিলেন সে তুমি জান, কিন্তু ছিরির কথাই যদি তুললে, বাবা তোমায়ও তো বিয়ে ক'রলেন?

মা একটু রাগিয়া বলিলেন, আরে হতভাগি, তবুও বিয়েটাতো হ'ল।

বিমলা বলিল, সেতো প্রত্যক্ষ, নইলে পোড়াকপাল নিয়ে তোমার পেটে জন্মাই? তোমার বাবা না-হয় সে-সস্তার দিনে জমি বাঁধা দিয়ে তোমায় পার করেছেন, কিন্তু উত্তরাধিকার-সূত্রে তোমার ছিরিটাই পেলাম, আর তোমার স্বামী-ভাগ্যদোষে আমার পারের কড়ির তহবিলটা ফুটোই থাকল। বলিয়া বিমলা নিষ্ঠুরের মত হাসিয়া উঠিল।

মা বলিলেন, তোর কি একটুও চিন্তা নেই, হ্যাঁরে?

বিমলা ইতিমধ্যে শুকনা কাপড় পরিয়াছিল, ভিজা কাপড়টা উঠানের এক কোণায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, কিসের? বিয়ের? সেতো হবার নয়; সে তুমিও জান, আমিও জানি।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, অলক্ষুণে কথা বলিসনে লক্ষ্মীটি, বিয়ের খবর যে তোর সত্যিই এসেছে।

এসেছে? তা' সতীনপো কটিরও খবর দিয়েছে নিশ্চয়ই।

মা অবাক হইয়া গেলেন। হঠাৎ কোনো জবাব আসিল না।

বিমলাই বলিল, একেবারে থ হয়ে গেলে যে। বিয়ে না হ'লে তোমাদের জাতও যাবে, আমারও দোজবরে বিয়ে হবে না, এতো হতে পারেনা,—পরের এঁটো খেয়ে বড় হয়েছি, এখন টাট্‌কা অছোঁয়া জিনিস চাইলে চলবে কেন?

মেয়েটির এই নির্লজ্জতায় মা নির্ব্বাক ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

বিমলা বলিয়া চলিল, সতীন-পো নিয়ে সংসার আর একমুঠো ভাতের জন্য বিয়ের নামে দেহ বিক্রী একই জিনিস। কোনোটাই আমার দ্বারা হবে না। বলিয়া বিমলা সরোষে বাহির হইয়া যায় দেখিয়া মা ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, তাই ব'লে এই ভর দুপুরে না খেয়ে বেরোবি নাকি?

যেন কিছুই হয় নাই এমনি করিয়া বিমলা বাড়ী-মুখো ফিরিতে ফিরিতে বলিল, তাইতো খানিকটে যে গিলতেই হবে, এবোধ তো ছিল না। আচ্ছা, মা, বলতে পারো, সৌন্দর্য্য থাক না

থাক, দেহের পরিচর্য্যা না করলেই নয় কেন? বলিয়া সোজা রান্নাঘরে গেল।

মা জবাব দেন নাই, জবাব পাইবার আগ্রহও মেয়ের ছিল না।

কি খাইল সে-ই জানে। মা কথাটি পাড়ি পাড়ি করিয়া বহুবার সামলাইয়া লইলেন। শেষে বিমলাই একবার থালায় জল ঢালিয়া দিয়া বলিল, দেখি, চিঠিটা একবার দাও দেখি।

আশঙ্কায় মা'র বুক কাঁপিয়া উঠিল। বলিলেন, কি করবি?

বিমলা নির্ব্বিকারভাবে বলিল, অতুলকে একবার দেখাব।

মা বলিলেন, অতুলকে?

তপ্ত ও কঠিন সুরে বিমলা বলিল, ভুল করোনি, শুনতে পেয়েছ বলেই মনে হ'চ্ছে।

মা ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, কিন্তু বাছা তোমাদের এই মেলা-মেশাটা...

বিমলা কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, খারাপ দেখায়, না? কেন বল তো?

তোমরা এক বয়সী...

তা' বটে, বয়সের একতা ভারী অন্যায়, কিন্তু একজাত নয়, জান?

তা জানি না? তাঁরা ব্রাহ্মণ।

অতুল বড় লোকের ছেলে জান?

জানি।

অতুল সুন্দর তা জান?

খুব সুন্দর। তবুও তোদের দুটিতে কত মিল।

বিমলা চটিয়া বলিল, ছাই জান। মস্ত ভীরু সে...থাক, চিঠিটা কই? হ্যাঁ, আর শোন, এ-বিয়ের চেষ্টা কোরো না। বলিয়া মুখ ধুইতে গেল।

মা পিছনে পিছনে আসিলেন, বলিলেন, আমি যে বড্ড নিরুপায় বিমলি; দেখছিস তো কত করে....

বিমলা বলিল, থাক আর কাছুনি গাইতে হবে না; যত পাপ সন্তানেই ক'রে আসে, না মা? সন্তানকে যারা জন্ম দেয়....আঃ, চিঠিটা দাও না, তাকে তো আবার পেতে হবে? মুরারী গেল কোথায় আবার? এই দেখ, স্কুল থেকে অতুলকে কি আমিই ডেকে আনব নাকি?

ততক্ষণে মা চিঠিটা আগাইয়া ধরিয়াছেন; বিমলা সেটিকে ছিনাইয়া লইয়া তাহার উপর একবার অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

অতুলকে একপ্রকার হিড়হিড় করিয়া টানিয়া একটা গাছতলায় দাঁড় করাইয়া বলিল, পড় দেখি; একটু ভাল করে পড়িস।

স্থানটা জনবিরলও নয়, সকলের চক্ষে না পড়িবার উপযুক্ত স্থানও নয়। কিন্তু এ বিষয়ে যাহার লজ্জা হইবার, তাহার একবিন্দু দৃষ্টি এদিকে ছিল না। অথচ যাহাকে এইমাত্র টানিয়া লইয়া আসা হইল, সে যে কোন দিক দিয়া এই লজ্জাহীনতা ঢাকিবে ভাবিয়া কূল পাইল না। তেমনই ধীরে ধীরে বলিল, আর কোথাও....

বিমলা বলিল, লজ্জা করছে? লজ্জা কিরে? একজন লিখতে পারল, সাত রাজ্যি ঘুরে এল, আর তোর এত লজ্জা!

বিমলা আসল কথাটার ধার দিয়াও গেল না দেখিয়া অতুল বলিল, বেশ ভাল ক'রে পড়তে হবে কিনা, আর কোথাও নিরিবিলি পড়িগে চ। বলিয়াই নিজে পা বাড়াইল, পাছে বিমলার প্রস্তাব মত এমনই একটা "নিরিবিলি জায়গায়" দাঁড়াইতে হয়।

বিমলার পথশ্রম বা পত্রপাঠে বিলম্ব কোনটাই সহ্য হইতেছিল না; বলিয়া উঠিল, ছাই তোদের লেখাপড়া, ঐটুকু তো লেখা, এরই এত হাঙ্গামা। নে, এইবার থাম, দাঁড়া এইখানে, এইতো বেশ জায়গা, পড়ে ফেল।

অগত্যা অতুলকে পথ-মাঝে থামিতেই হইল; জায়গাটাও অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। অতুল জিজ্ঞাসা করিল, পড়ব?

বিমলা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, শোন কথা, বলছি কি এতক্ষণ ? ভাখ দেখি।

অতুল পড়িতে লাগিল। চিঠির প্রত্যেকটি কথা বিমলা কি ভাবে গ্রহণ করিতেছিল, বলা কঠিন, কিন্তু যেভাবে অতুলের দিকে তাকাইয়াছিল, মনে হইতেছিল, বিমলার প্রতিটি শিরা উপশিরা উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এক সময়ে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, লিখেছে কে ভাখ দেখি।

অতুল বলিল, দেখি—এই যে রামপ্রসন্ন ঘটক।

বিমলা বলিল, ও বাবা, একেবারে ঘটক মারফৎ ? মস্ত কৃপা যে, অবস্থার কথা কি লিখেছে ?

অতুল বলিল, সচ্ছল।

বিমলা বলিল, তার মানে ?

অতুল বলিল, তার মানে ভাল। ওকালতির পয়সা ভালোই তো হবে। কিন্তু দেশটা যে অনেক দূর।

বিমলা বলিল, দুর্গা পিরতিমে যখন ডোবায়, তখন জল কম হ'লেই আক্ষেপ থাকে, ভয়ানক গভীর ব'লে কে কবে হা-হুতাশ করেছে ? ও থাক, তুই পড়।

অতুল পড়িতে লাগিল। আবার এক সময়ে বিমলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; একটু জোরেই। অতুল জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকাইল।

বিমলা হাসিতে হাসিতে বলিল, বয়সটা কত বললি, অতুল, পয়তাল্লিশ ? মাত্র ?

অতুল না পারিল হাসিতে, না-পারিল কোন জবাব দিতে। এই এই অদ্ভুত মেয়েটার দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল, বয়সের প্রসঙ্গ লইয়া সে এই মাত্র যে খবর দিয়াছে, তাহা কি মেয়েটার বুকে একটুকুও বাজে নাই, অথবা সে ইহাকে এখনও অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে ? কিন্তু এ যে একদম পাকা চিঠি !

বিমলা তেমনই হাসিতে হাসিতে বলিল, ঘটকটি কিন্তু বেশ গুছিয়ে লিখতে জানে, সংক্ষেপে একদঙ্গল ছেলেপুলের কথা কিছুই বাদ দেয় নি, বিয়ে না হতেই এক কাঁদি। ভাবতে পারিস অতুল ?

অতুল ছাই ভাবিবে। অতুল যে পুরুষ। বিধবা-বিবাহের প্রচলন এখনও তো বাহাদুরির হাততালির গণ্ডী পার হইয়া আসে নাই যে, সুবিধাপুষ্ট পুরুষ ভাবিতে বসিবে, পুত্রাদি-সহ সদ্য-বিবাহিত পুরুষ সংসার করিতে যাইতেছে। সহসা কুমারী অবস্থায় পরের সংসারের দায়িত্ব লইবার জন্য ডাক পড়ে মেয়েদের এবং তাহারা সেই দায়িত্ব হাসিমুখে সহিলে ভারতের বৈশিষ্ট্য বলিয়া প্রচার করি, না পারিলে, সংস্কার হিংস্র প্রবৃত্তি তেমনই ঢাক ঢোল পিটাইয়া প্রকাশ করি। অতুলের মনে হইল, এই মেয়েটা যে বাধ্য হইয়া এই ঘর সংসার অতি সহজে ভাঙিতে পারিতেছে, ইহার সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান কতটুকু বিস্তৃত, চিন্তাই বা কতটুকু ? বৈধব্য তো নিশ্চিত।

ঠিক এই কথাই বিমলা ভাবিতেছিল বোধ হয়। সে বলিল, বলতো অতুল, কি কাপড় পরে' আমার বিয়ে হবে ?

অতুল অবাক হইয়া বলিল, কেন রাঙা চেলি…

বিমলা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, দূর, তুই কিছু যদি বুঝিস— সাদা চেলিরে, সাদা চেলি। চল এবার ফিরি। বলিয়া সে অতুলের অপেক্ষা না করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

না ফিরিয়াই বলিল, ছোট্ট একটা ছেলে আছে লিখেছে না ?

উত্তর আসিল, হ্যাঁ।

বিমলা তেমনভাবেই বলিল, জানিস, বুড়োকে কিন্তু আমার দেখতে ইচ্ছে করছে, তাকে যদি দুপায়ে'…

ছি, বিমলা তিনি তোমার....

বিমলা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, স্বামী ? না ? তা হবে। কিন্তু বিয়ে তো সত্যিই আর হচ্ছে না।

প্রশ্ন হইল, হচ্ছে না ?

জবাব হইল, না।

তারপর বহুক্ষণ কথা হইল না। তাহারা বিমলাদের বাড়ীর প্রান্তে পৌঁছাইয়া গেলে, অতুল বলিল, বিমলা, তোমার ছেলেরা কিন্তু কোন দোষ করে নি।

বিমলা হঠাৎ ভীষণ মূর্ত্তিতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বলিস কি কি অতুল, তারা যে আমার শত্রুর ছেলে!

শুষ্ক বিকট মূর্ত্তিতে বহু বেলায়—ভোরের দিকে—নিজের দরজা সশব্দে খুলিয়া ফেলিয়া সশঙ্কিত মাকে সুমুখে পাইয়া বিমলা বলিল, বিয়েটা চুকেই যাক মা, তাদের লিখে দাও।

অপ্রত্যাশিত সংবাদে মা'র হাসি ফুটিয়া উঠিল; অস্থিরচিত্তে বলিতে গেলেন, এ ক'রে তুই যে আমায়....

বিমলা মাঝপথেই ধমক দিয়া উঠিল; থাক, ন্যাকামোটুকু রাখো, আগে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় তো করো। বলিয়া সোজা পুকুরঘাটের দিকে পা বাড়াইল।

সারারাত সে একপ্রকার ঘুমায় নাই। চিন্তার ক্ষেত্র তাহার কতটুকু? কিন্তু এই বয়সেই সে এই ভাবিয়া অবাক হয় না যে, এ সংসারে মিত্র বলিয়া কোন বস্তু থাকা সম্ভবপরও নহে, স্বাভাবিকও নহে। পাড়াপড়শীরা যেন দাঁত খিঁচাইয়া আছে, পারিলে ইহারা ইহাদের উদ্যত লাঠিটা ঘাড়েই বসাইয়া দেয়; কেহ একটা সোহাগের কথা বলিয়াছে বলিয়া আজ বিমলার মনে পড়ে না; আর টাকা বলিয়া এমনই একটা পদার্থ এ সংসারে আছে, যাহা না থাকিলে লোকে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করে, নয় তো ভুলিয়াও মিষ্টি কথা মুখে আনে না। সংসারটা একেবারেই বিস্বাদ ও তিক্ত, ইহাতে একেবারে ভুল নাই, কিন্তু এইখানে মাও কি এমনই, অথবা ইহাঁর স্বাতন্ত্র্য

বলিয়া কিছু থাকাটার মধ্যে কোন কারণই নাই? কল্পনাটাই অস্বাভাবিক—মেয়ে পার করিবার ঐ একই তাড়া, উহাতেই তাঁহার পরমার্থ। বিমলা ছোটকাল হইতেই তাহার মাকে যেভাবে তাহার জন্য চিন্তা করিতে দেখিয়া আসিতেছে, তাহাতে সে এই নারীটিকেও অন্যান্য নারী হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে তো পারেই নাই, বরং ইহাঁর অতিরিক্ত মাথা-ব্যথা দেখিয়া সেই পরিমাণ বিরক্তিই জমাইয়া তুলিয়াছে। পুরুষগুলিও কি তেমনি। মেয়েমানুষের প্রতি ইহাদের লোভের অন্ত নাই, অথচ ইহাদের দাসী করিয়া রাখিবার কতই না ষড়যন্ত্র। পুরুষমানুষের ভালবাসার মত এমন একটা মিথ্যা আর কিছুই হইতে পারে না। পনের বছরে তো ভরপুর যৌবন কিন্তু বিমলা নিজের সম্বন্ধে একেবারে উদাস ছিল। ছিল সত্য, কিন্তু তাহাতেও যখন পাড়ার দুই একটা ছেলে তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত জানাইয়াছিল, বিমলা তাহাদের নির্ব্বাক বিস্ময়ে বিদায় দেয় নাই, বরং পুরুষের এই স্বার্থপরতার পুরস্কার-স্বরূপ দ্বিতীয় ছেলেটিকে এমন জোরে একটা চড় মারিয়াছিল যে, বিমলাকেই শুশ্রূষা করিয়া কামিনী-বিজয়াভিলাষীর জ্ঞান ফিরাইয়া আনিতে হইয়াছিল। ইহার দ্বারা একটা লাভ এই হইল যে, সংসারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষটা বিমলার যেমন সম্পূর্ণ হইল, বিমলা দরিদ্র হইয়াও ভোগের বস্তু হিসাবে সহজলভ্য নহে, এই কথাটা পাড়ায় সকলে জাতি-নির্ব্বিশেষে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিল। বাণিজ্য ব্যবসায়ের দর-কষাকষি ছাড়া, কেবলমাত্র তাহার বিবাহ-সংবাদ বহিয়া লইয়া কেহ আজও এ বাড়ীতে অনুগ্রহ করিয়া দেখা দেয় নাই, তেমন বার্ত্তা লইয়া কোন লিপিও পৌছায় নাই। রামপ্রসন্ন ঘটক ঘটকালিতে কত টাকা পাইয়াছেন অথা পাইবেন, সে-খবরও এই চিঠিতে নাই, কিন্তু এই চিঠিতে অর্থের কোনপ্রকার দাবীও যে নাই, এই নতুনত্বটুকু বিমলা অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত অনুভব করিল। বরের বেশী বয়স সত্য, কিন্তু কেবলমাত্র বয়সের লজ্জা ও দুর্ব্বলতা

বাংলার কোন পুরুষের স্পর্দ্ধাকে এতখানি নমিত করিতে পারে? একি আদৌ সম্ভব, না, অন্য কোনো দৈহিক পঙ্গুতা লোকটিকে ক্ষয়িত করিতেছে? অসম্ভব কি? দৈহিক ক্ষতিটা যাহার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, তাহার মনের কামড়ানি যে ততগুণ অসহ্য। কিন্তু সন্তানও তো বড় কম হয় নাই? সাত সাতটা। আশ্চর্য্য, এই সাতটি সন্তানের জন্ম দিতে যে ব্যক্তি একটা ফাঁক সৃষ্টি করিয়া মিলাইয়া গেল, তাহাকে ভরিয়া তুলিবার জন্য বিমলার জন্ম নাকি? ভোগের সম্পূর্ণ অংশ কোনদিনই তাহার ভাগ্যে নাই, থাকিলে কি সাধ করিয়া কেহ গরীবের ঘরে জন্মায় নাকি? বিমলার অগ্রবর্ত্তিনীটি আর যাহাই হউক সৌভাগ্যবতী, আর তাহারই প্রসূত সন্তানের দাসীপনার জন্য তাহার ডাক পড়িয়াছে। সকলেই সংসার গুছাইয়া লইয়াছে, লইতেছে। তেমনই একটা গোছানো সংসারে পত্নী ও কর্ত্রী নামে তাহাকে প্রবেশ করিতে হইবে, অনিচ্ছায় ও পঁয়তাল্লিশ বছরের একটা অপরিচিত মানুষকে অতি পরিচিতবোধে…ছি ছি' ইহাই বিবাহ না? এ সংসারটা কি, য়্যাঁ, অথচ নিস্তার কই? আত্মসমর্পণ? সংসারের কাছে আত্মসমর্পণ? হ্যাঁ, আত্মসমর্পণ না করিলে আগুন ধরাইয়া দিবার সুযোগ কই? পাশের ঘরে কি মা কাঁদিতেছেন? কেন কাঁদেন তিনি? বিদায় করিতে লাগিবে বলিয়া, না, বিদায় করিতে চাহেন বলিয়া? বলেন—নিরুপায়। নিরুপায়, তা আমি কি করিব? বারে। জন্মিয়া আমি উপায় করিব বলিয়া কি জন্মিয়াছিলাম? এতদিন কিন্তু ভালই ছিল, কেহ দয়া করিয়া তাহাকে বিনা পয়সায় তরাইতে আসে নাই, আজ যে হঠাৎ এমন একটি ধূমকেতু দেখা দিল একি তাহার বিবাহ অনিবার্য্য বলিয়া? বিবাহ না করিয়াই বা সে কি করিবে? বাড়ীতে মা আর ভাইটি ছাড়া কেহই নাই, খাদ্যব্যবস্থারও এমন নিশ্চিত প্রচুর ব্যবস্থা নাই, তবে কতকাল এই প্রকারে চলিবে? বয়স ত মানিবে না, বাড়িয়াই চলিবে, বিবাহ না করিলেও বাড়িবে এবং এইখানেই দিনরাত মাথা কুটিয়া কোঁদল করিয়া মরণকে

ডাকিতে হইবে। সেও তো নৈরাশ্য ও বৈধব্যেরই জীবন, তবে এই নৈরাশ্য ও বৈধব্যের অন্তর্নিহিত হুতাশন দিয়া এই ঘৃণিত সংসারটা ভোগের ঘি'য়ে পোড়াইয়া ছাই করিয়া দেয় না কেন? কিন্তু তাহা করিতে গিয়া নিজেরই কতকগুলি সন্তান যদি হইয়া বসে? এই চিন্তার উত্তেজনায় শরীর বাহিয়া একটা শিহরণ খেলিয়া গেল, কিন্তু তাহার পর মুহূর্ত্তেই যে অবসাদ দেখা দিল, তাহাতে কোথায় যেন একটা অস্পষ্ট আনন্দ বিমলাকে উদভ্রান্ত ও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ইহার পর বিহ্বলতা ও উন্মত্ততা ঘুরিয়া ফিরিয়া একই সঙ্গে আসা যাওয়া করিয়া তাহাকে কখন যে ঘুম পাড়াইয়া দিল, সে জানিতেও পারে নাই।

কিন্তু ইহারই মধ্যে একসময়ে তাহার মনস্থির হইয়া গিয়াছিল; ভোরে জাগিয়া উঠিয়া তাহার আর সন্দেহ বা দ্বিধা রহিল না। অনাগতকে একপ্রকার নিশ্চিন্ত জানিয়াই সে বরণ করিবে বলিয়া গা' ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইল। মায়ের উপায়হীনতার ধীরস্থির আঘাত এই অনির্দ্দিষ্ট ভাগ্যে এককালে নির্দ্দেশ না দিয়া পারিল না। লজ্জা যদি তাহার এইখানেই নাই, তবে লজ্জা বলিয়া কোনো বস্তুই তাহার থাকা সুসঙ্গত নহে; ইচ্ছা বলিয়া কোনকিছু বাড়ীতেও যদি না খাটে, সংসারে ইচ্ছা বস্তুটা তবে মিথ্যা; গঞ্জনা যদি নিত্যকার, তবে ইহার শেষ না হউক। দুর্ভাগ্য স্বয়ং যদি তাহার কপালে টিকা আঁকিয়া থাকে, তবে তাহাই সফল হউক, দায়িত্ব তাহার একবিন্দুও ইহাতে নাই। সে শুধু বিবাহ করিবে ইহাই স্থির করিল না, যে-শত্রু তাহাকে পত্নীরূপে চাহিতেছে, তাহাকেই স্বামীরূপে পাইতে হইবে স্থির করিল।

সুতরাং বিবাহ হইয়া গেল; নির্ব্বিঘ্নে হউক, বিঘ্নে হউক, ঘটনাটা অনিবার্য্যরূপেই ঘটিয়া গেল।

আসিবার কালে মাতা বা গুরুজন কাহারও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল না।

মা শঙ্কিত চিত্তে বলিলেন, এ কী অলুক্ষণে কথা বলিস, ছি।

বিমলা সংক্ষেপে বক্তৃতায় বাধা দিয়া বলিল, থাক।

সবাই যে দাঁড়িয়ে আছেরে।

বিমলা বলিল, আমি তো তাঁদের দাঁড় করাইনি। তাঁরা যেতেও পারেন, বসতেও পারেন।

মা বলিতে চেষ্টা পাইলেন, আমার দিকে চেয়ে....

বিমলা বলিল, বিয়েটা কি আমার দিকে চেয়ে হয়েছে, না, মা-বাপের দিকে চেয়ে বলিদানের জন্যই ছেলে-মেয়ে জন্মায়?

ইহার উত্তর চলে না।

স্বামীর বাড়ীতে আসিয়া কিন্তু প্রাথমিক আচারগুলি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও মানিয়া লইল। পথের নিশ্চুপতাকে সকলেই লজ্জার চিহ্ন বলিয়া ঘোষণা করিল বটে, কিন্তু পাড়ার দিদিমারা বা রূপসীরা ইহার রূপ ও বয়স দেখিয়া চাপা অশ্লীলতায় মেয়েদের সভায় একটা হর্‌রা বহাইয়া দিল। নববধূকে বরণ করিবার জন্য কে-ই বা ছিলো, তবু কিছুই বাদ রহিল না, যেমন করিয়া কাজ-কর্ম্মে একজন-না-একজন আত্মীয় জুটিয়া যায়ই। বিমলার সহিত কাহারো শুভ-দৃষ্টি হইল না, কিন্তু কে একটা মেয়ে ধুপ করিয়া তাহার কোলে কি একটা নরম পদার্থ ফেলিয়া দিল এবং 'এই তোমার কোলের ছেলে' বলিয়াই পলাইয়া গেল। তখন বিমলার হুঁস হইল, চমকাইয়া প্রায় ফেলিয়া দিতেছিল, কিন্তু কি করিয়া বস্তুটি থাকিয়া গেল।

সর্ব্বপ্রথম যাহার সহিত তাহার দৃষ্টি-বিনিময় হইল, সেটি শত্রুর ছেলে।

উভয়ে উভয়কে দেখিতে লাগিল।

ইহার মুখের ছাঁচ, বিমলা ভাবিতে লাগিল, তাহার নিজের নহে, তাহার স্বামীর নহে। 'স্বামীর নহে' ভাবিতে বিমলার সর্ব্বশরীর ঘামিয়া উঠিল। স্বামীই তো বটে, তবে সতীনের স্বামী—পরম দুর্ভাগ্য তাহারও স্বামী। হ্যাঁ তাহাদের সন্তান। তাহাদেরই সন্তান,

বিমলার কেহ নহে। ইহার অত্যন্ত ফর্সা রং যেন তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। সতীনের টিট্‌কারী। সুপুষ্ট নিটোল স্বাস্থ্য। মুরারীর মত দারিদ্র্যে প্রতিপালিত হয় নাই, সচ্ছলতায় মাংসালো হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেটার মুখে হাসি নাই, কান্নাও নাই, কি ভাবিতেছে এই ছেলেটা?

বাস্তবিক, কি ভাবিতেছে এই ছেলেটা? তাহার কোল-আশ্রয়ের এত ঘন-ঘন পরিবর্ত্তন হইতেছে কেন? আধ-ঘোমটা দেওয়া এই মুখখানা কাহার? বড়দি তাহাকে ইহার কাছে দিয়া গেলেন কেন? শিশুর যে জন্তুর স্বভাব আছে, অর্থাৎ স্পর্শের ইঙ্গিত বুঝিবার ক্ষমতা আছে, তাহা দ্বারা সে যেন বুঝিতে পারিল, এই নতুন মুখখানি কোমল ও সুন্দর নহে। তবে ইহারই হাতে তাহাকে বিসর্জ্জন দেওয়া হইল কেন? খানিকক্ষণ এই প্রকার বিহ্বল অবস্থায় কাটিয়া গেলে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই আর্ত্তনাদের আহ্বানে গোটা পাঁচ ছয় ছেলে-মেয়ে একই সঙ্গে হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহাতে ফল এই হইল যে, বিমলা যেমন লজ্জিত ও সন্ত্রস্ত হইল, ইহাকে পূর্ব্ব-কল্পিত ষড়যন্ত্র মনে করিয়া কেবল কোলের ঐ ছেলেটাই নহে, সমগ্র সংসারের উপর ভীষণ ক্ষেপিয়া উঠিল।

'আয় পুতু' বলিয়া একটি মেয়ে যখন হাত বাড়াইল, তখন একবার মনে হইল, এই ছেলেমেয়ের দলটাকে তাড়াইয়া দিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু তাহার এই রোখটা শুধু এক প্রকারেই প্রকাশ পাইল, ছেলেটাকে সে নিঃশব্দে কোল হইতে নামাইয়া দিল।

ইহার পর সংসারের সহিত তাহার আপোষ চলিতে পারে না।

বিমলা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিজ্ঞা করিল, দাসীবৃত্তি করিতে সে আসিয়াছে বটে, কিন্তু পত্নীর দাবী লইয়া একবার সে কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবেই—প্রাণপণ। এই নির্লজ্জ সন্তানশ্রেণীর প্রতি এতটুকু কৃপাকণা বাড়ীর কর্ত্তাটির যতদিন পর্য্যন্ত উৎসারিত

হইবে, ততদিন বিমলার নিশ্চিন্ত আলস্যে গা ঢালিয়া দিলে চলিবে না। খুঁটিয়া খুঁটিয়া কোথায় কি আশ্রয় ইহাদের আছে, তাহা আবিষ্কার করিয়া নির্ম্মূল করিতে হইবে।

হঠাৎ কি করিয়া মুরারীর কথা মনে হইল। মুরারী যে তাহার ভাই, তাহার ছোট ভাই, এই তত্ত্বটা আজ একটা আবিষ্কারের মতই তাহার মনে হইল। হায়রে, মুরারী তাহার ভাই, অথচ এই ভাইটিকে সে কোন দিন আদর করিয়াছে বা স্নেহ দেখাইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না। দরিদ্রের শূণ্যতার ঘরে জন্মিয়া তাহার ঐটুকু আশ্রয় কতই না প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিমলা কি করিয়াছে? অন্ধের মত চিরকাল বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে তাহাকেই, যাহার ঐটুকু প্রাপ্যের অভাবে জীবনটা একেবারেই—চাইকি—নিষ্ফল হইয়া যাইতে পারে। মুরারীর কি দোষটা ছিল? দোষটা যে কি ছিল, হৃদয়ের অভ্যন্তরে পাতি-পাতি করিয়া খুঁজিয়াও বিমলা এতটুকু কণিকাও খুঁজিয়া পাইল না। বিমলার নিজেকে আজ যতখানি ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইল, ঠিক ততখানি সুন্দর ও কোমল হইয়া ফুটিয়া উঠিল মুরারীর মুখখানি; অমন একখানি সুন্দর মুখ আর আছে বলিয়া বিমলার মনে হইল না। অথচ নৈরাশ্য হইতে তাহার জীবন সুরু, নৈরাশ্যেই শেষ হইবে হয়তো; যতদূর দৃষ্টি যায়, কোনপ্রকার প্রতিকার বিমলার চোখে পড়িল না। অন্ধকারের জীবের মত কোনমতে পায়ে হাঁটিয়া অতি সন্তর্পণে চলিতেছে ঐ মৃত্যুপথযাত্রীটি কে,—যাহার জরা-বার্দ্ধক্য যৌবনের মাঝখানেই বাসা বাঁধিয়াছে?

বিমলা জীবনে কোনদিন কাঁদিয়াছে মনে পড়িল না, কিন্তু আজ অশ্রুধারা বাধা তো মানিলই না, ইহা যে কখন থামিবে বিমলা ভাবিয়া পাইল না।

যখন থামিল, তখন বাহিরে প্রচণ্ড সূর্য্যের কড়া রোদ ঝরিয়া পড়িয়া ছায়াগুলিকে খাটো ও ছোটো করিয়া ফেলিয়াছে; অথচ আশ্চর্য্য এই, এতটা সময় কাটিয়া গিয়াছে, কেহ তাহার খোঁজ

লইতে আসে নাই; তাহাকে বাঘিনীর মত সকলে এড়াইয়া চলিয়াছে। চলুক।

বিমলা উঠিয়া একটা জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইল; বাহিরের রোদ তাহার চোখের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁপিতেছে। এদিকটার ছোট্ট একটু জমি, খানিকটা খুঁড়িয়া রাখা, কি বুনিবে হয়তো, মাঝে একটা নেবু গাছে প্রচুর নেবু ধরিয়াছে; এত প্রচুর যে নীচে অনেকগুলি হলদে নেবু ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; বাঁ' পাশটায় একটা সজনে গাছ, ঐ কোনে পাকা পায়খানাটা, তাহার উপর একটা পেয়ারার ডাল আসিয়া পড়িয়াছে, একটা বড় আমগাছ বাঁশের বেড়া ডিঙাইয়া বাড়ীর ভিতর দেখিতেছে—আর পাশের ঘরটার টিনের চালের উপর রোদগুলি কাঁপিয়া কাঁপিয়া নাচিতেছে।

মা!

বিমলা মুখ ফিরাইল; দক্ষিণের ছোট দরজা দিয়া একটি অবাঙালী পুরুষ আধ-ন্যাংটা কাপড় পরিয়া ডাকিতেছে। বিমলাকে মুখ ফিরাইতে দেখিয়া বলিল, মা, চানের জল দে'য়া হ'য়েছে।

বিমলা উত্তর দিল না, তাকাইয়া রহিল।

লোকটি বলিল, আপনার কাপড়টাই কেবল দেয়া হয়নি, মা, নইলে—

বিমলা অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এবাড়ার—

চাকর, মা। পিসীমার কাল থেকে আছি, ছেলেপুলের অনেক গুলোই আমার কোলে-কাঁখে··

বিমলা বলিল, সে-কথা থাক, তোমার নাম?

সে যথাসম্ভব বিনীত-কণ্ঠে বলিল, লছমন।

বিমলা বলিল, আর সব্বাইর চান হয়ে গেছে?

লছমন্ বলিল, হ্যাঁ, সব্বাই সেরে নিয়েছেন, কেবল....

আমিই বাকী, না, লছমন? ওটা আজ বাকী-ই থাকবে।

লছমন অবাক হইয়া গেল, বলিল, কেন মা ?

বিমলা মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল, ফিরিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, শোন লছমন, কোলে-কাঁখে ক'রে ছেলেপুলেই মানুষ ক'রেছ, বাড়ীর গিন্নীর কৈফিয়ৎ তলব করতে পার না, এটা পিসিমা তোমায় শেখায় নি বুঝি ? তুমি যাও আমি নাইব না।

বিস্মিত বিমূঢ় লছমন নবাগত কর্ত্রীর রোষের দাপট প্রথমটায় সামলাইয়া লইতে কষ্ট পাইল, তাহার পর বলিল, অন্যায় কোনো কথা তো...

বিমলা অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, তুমি যাবে কি না ?

যাব না কেন, মা, আমরা চাকর বৈ ত নয়, বলিতে বলিতে লছমন চলিয়া গেল।

উঠানের আনাগোনা প্রায় কমিয়া গিয়াছে; যে ছেলেপুলে-গুলি কলরব করিতেছিল, তাহারাও কে-কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে; বাড়ীটা অনেকটা নিঝ্‌ঝুম হইয়া আসিয়াছে—তবুও উঠানের দিকের খোলা জানালা দুইটা বিমলার চোখে ভাল ঠেকিতেছিল না, অথচ উঠিয়া গিয়া সেগুলি বন্ধ করিবে সেরূপ সামর্থ্যও যেন ছিল না। তক্তপোষের উপর গুম হইয়া বিমলা বসিয়া রহিল ; সমস্ত শরীরে যেন আগুন ধরিয়া গিয়াছে, মাথার ব্যথাটা যেন অসহ্য বোধ হইতেছে।

অবহেলা ! এ-সংসারটায় ছোট হইতে বড় পর্য্যন্ত সকলেই কি তাহাকে অবহেলা করিবার অধিকার পাইয়াছে, আর সে-ই শুধু অবহেলিত হইবার জন্য জন্মিয়াছে ? কিন্তু, না—ইহাই যদি বিধির নির্দ্ধারিত নির্দ্দেশ থাকে, তবে বিমলা তাহাকে অস্বীকার করিবে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবে। সমগ্র বিশ্বকে ঔদাসীন্যের আঘাতে পরাজিত করিয়া ঔদ্ধত্য ও স্পর্দ্ধিত উগ্রতাকে তাহার পায়ের তলায় অবনমিত করিয়া ছুটি দিবে। বিমলা এই যে এই ঘরে কায়েম হইয়া বসিল, এখান হইতে কেহই তাহাকে নড়াইতে পারিবে না এবং এইখানে থাকিয়াই সে সমস্ত বাড়ীটার উপর খবরদারি করিয়া

যাইবে। অথচ এমন করিয়া সে নিজেকে সকল কর্ম্ম হইতে ছিনাইয়া রাখিবে যে, তাহার কাছে মাথা না কুটিয়া এখানে কাহারও টেঁকা চলিবে না। সবাই আসুক, আসিয়া নির্জ্জলা ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া যাক, স্পর্দ্ধা বা দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত এই দুয়ারে মাথা ঠুকিয়া করিয়া যাউক। তাহার পর ইহারা যখন সকলেই একে একে হাতের মুঠার ভিতর আসিয়া পড়িবে, তখন তাহাদের প্রত্যেককে পৃথক করিয়া এইটাই স্পষ্ট বুঝাইয়া দিবে যে, ইচ্ছা করিলে বিমলা সকলকেই চট্‌কাইয়া পিণ্ড পাকাইয়া ফেলিতে পারে, তবে সে ইহা করিতে ঘৃণাবোধ করে। তাই বলিয়া ক্ষমা সে করিবে না, কাহাকেও না। দরিদ্র তাহার মা, দরিদ্র তাহার ভাই, দরিদ্র সে নিজে, তাই বলিয়া কেবলমাত্র নিঃস্ব হইবার যুক্তিতে কাঙালিপনা সে করিতে পারে না, করিবেও না। বিশ্বটা উন্মত্ততার মুহূর্ত্তে যদি ভাবিয়া থাকে সে শূন্য গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ফাঁক পূরণের জন্য হাত পাতিয়া কাঁদুনি গাহিয়া যাইবে, তবে ভগবান নামক যে অর্থহীন ভাগ্যনিয়ন্তা রহিয়াছে, সে গোড়াতেই বিমলাকে ভুল বুঝিয়াছে। এই ঘর, এই ঘরের আসবাব যে একান্তভাবে তাহার, ইহা সে প্রমাণ করিয়া যাইবে।

কিন্তু সে কি এইভাবে? নিশ্চিন্তে সঙ্কীর্ণ কোণে ক্ষণ গুণিয়া? সমস্ত বিশ্বকে এইটুকু জায়গায় পুরিয়া রাখিবে সে কি করিয়া? বাহিরের অন্য ঘরগুলিতে যাহারা রহিয়াছে, যাহারা খাইয়া যায়, যাহারা রান্না করে, যাহারা হুকুম করে, যাহারা হুকুম মানে—তাহারা সকলেই যদি এইরূপে তাহার সংসারের বাহিরে থাকিয়া গেল, তবে কাহাদের লইয়া তাহার রাণিগিরি? তাহার রাজত্বের সহিত সে যদি অপরিচিতই থাকিয়া গেল তবে তো আবার সেই বঞ্চনার ঘূর্ণাবর্ত্তে টাল খাইয়া মরিতে হইবে। সংসারের চলতি ধারার প্রতি রক্ত-কণায় যদি তাহাকে প্রবেশ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা আনিয়া দিতে হয়, তবে তাহাকে এই জড়তা ভাঙিয়া উঠিতে হইবে;

হাওয়ায় যদি তাঁহার উষ্ণ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দিতে হয়, তবে এতদিন-কার পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস বিষের মত সর্ব্বত্র মিশাইয়া দিতে হইবে, বেসুরো কর্কশ শব্দে শান্ত তপোবন যদি সচকিত ও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হয়, তবে তাহাকে কথার হল্কা ছাড়িতে হইবে—এতটুকু স্থান না অপ্রতিধ্বনিত থাকে এমনি-ভাবে; রূপের অহঙ্কার যদি এই বাড়ীর কোন রন্ধ্রেও প্রবেশ করিয়া রহিয়া থাকে, তবে তাহাকে বিমলা তাহার নিজস্ব রূপহীনতার আঁকশি দিয়া ক্ষত বিক্ষত রূপে টানিয়া বাহির করিবে; সরস রসের প্রস্রবণ যদি এই গৃহবাস সিক্ত ও সজীব করিয়া রাখিয়া থাকে, তবে তাহাকে সম্পূর্ণ শুষিয়া লইয়া শুষ্ক রুক্ষ করিবার কাজ বিমলার; স্নেহ-দয়া-মায়া মমতার স্পর্শে কোন অংশ যদি কোমল ও পেলব হইয়া থাকে, তবে তাহাকে বন্ধুর করিবার ব্রত বিমলার; যে না জানে কোমলতা, না বোঝে মমতা; পূতিময় দুর্গন্ধের আমদানি করিয়া বিন্দুমাত্র সুগন্ধির অবস্থিতিকে ম্লান করিয়া ফেলিতে হইবে। বিমলা সংসার বুঝিয়া লইবে, তারপর ঐ স্পর্দ্ধিত লছমন হইতে সুরু করিয়া···

যাক।

বিমলা দরজা ঠেলিয়া উঠানে নামিয়া আসিল।

দশ বছরের হেমি স্কুল ছুটির পর কোথা হইতে, ধূলা-কাদা-মাখা দেড় বছরের প্রতুলকে অতিকষ্টে কোলের উপর বহিয়া মজুমদারদের বাড়ীর পাকা বারান্দায় ধুপ করিয়া নামাইয়া বলিল, বোস তো পুতু, কাপড়টা সামলে নি।

মজুমদারদের বাড়ীটা তাদের লাগ বাড়ী। সমস্ত সংসারে বর্ত্তমানে দুইটি পুত্র—মেজ ও ছোট, আর এক বৃদ্ধা। বৃদ্ধাটি ছেলে দুইটির মা ও অভিভাবিকা এবং পাড়ার বিখ্যাতনামা দিদিমা। মেজ ছেলেটি পি-ডবলিউ ডি'তে কেরানীগিরি করে, কনিষ্ঠটি এখনও স্কুলের সীমা ডিঙাইতে পারে নাই। মেজটিই যে পারিয়াছিল, তাহা নহে, তবে অল্প বয়সেই চরিত্রের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতে গিয়া যে কুৎসিত সভ্য রোগ আহরণ করিয়া ঘরে ফিরিল, তাহা দেখিয়া সশঙ্কিতা মাতা পুত্রের কল্যাণার্থে এক নম্বর চাকুরী ও দুই নম্বর বিবাহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, সফলকামও হইলেন। তখনকার দিনের লোকাভাবে ও সুপারিশে মেজটির চাকুরী হইয়া গেল এবং শীঘ্রই বধূনির্ব্বাচন হইবে ভরসায়, ছেলেটিও নিজের "সংযত চরিত্র"কে সঙ্কুচিত করিয়া আনিল। শুভলগ্নে একদিন বিবাহ সত্যই হইয়া গেল; কেবল যৌবনের পদচিহ্নের ছিটে ফোঁটা তাহার ঔরসজাত সন্তানের দেহে উল্কির মতো নক্সা কাটিতে লাগিল। ছোটটির বিবাহ হয় নাই, ইহার বিবাহের দিক হইতে তাড়াও ছিল না।

কিন্তু দিদিমার এসংসারে যেন মন ছিল না, তাঁহার সমগ্র মনটি পড়িয়া থাকিত তাঁহার বড় ছেলের কাছে, যিনি ছিলেন মস্ত বড় অফিসার। বিদেশে বিভুঁয়েই সস্ত্রীক তিনি মোটা মাহিনা ও আর্দালি ইত্যাদি সহ খবরদারী করিতেন; সেই চিত্রটি দিদিমাকে সর্ব্বদাই উদ্ব্যস্ত রাখিত। পারিলে, পারিলে কেন, কথাচ্ছলে তিনি তাহার সংসারের কথা, তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের কথা, স্বয়ং-দিদিমার ইটোয়ারী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, জব্বলপুর ইত্যাদি ভ্রমণের বার্ত্তা এবং কোন্ কোন্ জায়গায় আগ্রার তাজমহলের মত দ্রষ্টব্য আছে, তাহা টিপিয়া টিপিয়া অত্যন্ত কলা-কৌশলে প্রকাশ করিতেন। পাড়ার বামী-ক্ষেমীরা যেমন আশ্চর্য্য হইত তেমনই হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত। বয়স ও বিধবার পর্য্যায়ে আসায় কি পুরুষ-মহল, কি অন্দর-মহল সর্ব্বত্র তাঁহার অবাধ-গতি এবং বয়ঃ-কনিষ্ঠদের তিনি কখনই 'তুই'

ছাড়া 'তুমি' বলিতেন না। স্বাস্থ্য এখনও নিটোল আছে, শুনা যায়, দিদিমার পঞ্চাশ পার হইয়াও দিদিমার মা এখনও বাঁচিয়া আছেন। পাড়ায় ইহাও একটি আশ্চর্য্য ছিল; এবং এই কারণেও দিদিমার প্রভাব বাড়িয়াছে। দিদিমা যে চতুর লোক, শক্ত লোক, ইহা সকলেই অবিসম্বাদিত সত্যরূপে মানিয়া লইয়াছিল। মায়ের এই অক্ষুণ্ণ প্রতিপত্তি ছেলে দুইটিকেও গর্ব্বান্বিত করিত; তাহারাও মাকে আবশ্যক অনাবশ্যক সকল খবরই দিত।

হেমির উপস্থিতির প্রত্যুত্তরে দিদিমা 'বড়ঘর' হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, বলিলেন, কিরে হেমি, বোস্ ঐ বারান্দাটা ঝেড়ে, পাকা বারান্দা, বঙ্কিমের সখ পাকা বাড়ী নইলে চলে না, মাটীতে পা ফেলতে ঘিন্ ঘিন্ করে। তা না হবেই বা কেন, ওর বাবাতো কোনদিন ধূলোয় নামে নি, তেমনি হয়েছে বড় ছেলেটা; পুণ্যির জোর তো কম নয়, ভগবান দেখলেন, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বারশ' টাকার চাকরি, হেমি, বারশ টাকা ভাবতে পারিস, একসঙ্গে অত টাকার মোটা চাকরী, তাই কি অহঙ্কার আছে, মা বলতে অজ্ঞান, মাসের সাতটা দিন না যেতেই বঙ্কুর পাঠানো পঞ্চাশটি টাকা মায়ের জন্য আসেবই···ছি ছি ছি, একি করছিস্, হেমি, পুতু'র গায়ে যে একমণ ধূলো-কাদা, ছাখ দেখি, একটা ভিজে গামছা দিয়ে, মুছেও আনতে পারিসনি। নাঃ, তোরা যে কী বুনো, আর তোদের দোষই বা কি; মা-মরা ছেলে, তার ওপর এল সৎমা আবাগী.... আহাহা, করছিস কি, করছিস কি, কোথাকার ধূলো-কাদা, তাই আবার নিজের কাপড়ে তুললি; না বাপু, তোরা ঘেন্না ধরালি, ছেলে তো আমরাও মানুষ করলাম—কে গো পুঁটি নাকি, আয় আয়, ছাখ দেখি হেমির কাণ্ড।

পুঁটি সান্যাল বাড়ীর মেয়ে, রূপসী সন্দেহ নাই, কিন্তু বিবাহের পর হইতে ভারী মোটাইয়া যাইতেছে, স্বামীর বাড়ী গৈ-গ্রামে বলিয়া ভাল লাগে না, যায়ও না সেখানে। পাড়ার মেয়ে, মাথায়

ঘোমটা থাকে না। বিবাহের পর হইতেই সে গম্ভীর বৃদ্ধার দলে নাম লিখাইয়াছে। সে বলিল, কি দিদিমা ?

দিদিমা বলিলেন, আর 'কি দিদিমা'। তোরা বামুনের মেয়ে তোরাই জানিস, বামুন-বৈছেরই যা কিছু ছোঁয়াছুঁয়ির জ্ঞান, কায়েতরা……ঐ যাঃ, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বোস্ না বেঞ্চিটায়, এই বেঞ্চিটা, জানলি পুঁটি, আর্টিজান-স্কুলের ওস্তাদ মিস্ত্রী দিয়ে তৈরী, যতীশ বলছিল, বাস্তবিক ওর পছন্দ আছে বটে, বোস্ বোস্……

পুঁটি বলিল, বসব না দিদিমা, হরিলুটের নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম।

দিদিমা বলিলেন, তার তো এখনো ঢের বেলা আছে, বোস্, আফিস থেকেই কেউ ফিরল না

পুঁটিও সেই প্রকার হিসাব করিয়াই আসিয়াছিল, বাপের বাড়ী কায়েম হইয়া থাকিবার এইটিই কি কম আকর্ষণ ? বিশেষ যে লোভনীয় বয়স্কাদের সভা হইতে সে তাহার শৈশবে বিতাড়িত হইয়া আসিয়াছে, আজ সেই সভা-সদস্যারাই তাহাকে সাদরে ও নির্ব্বিচারে আহ্বান করে, এইটুকুর কম আকর্ষণ, না, ইহা এড়াইয়া যাওয়া চলে ?

দিদিমা বলিতেছিলেন, বাস্তবিক, শাস্ত্রে বলে গেছে হরির্নামৈব কেবলম্, কলিযুগে কেবল হরিনামই তরিয়ে নে যায়, নইলে সংসারটা কি বল্ দেখি ? একটার বিয়ে বাকী, সে একদিন হলেই হল, আর বিয়ে যে কী সর্ব্বনাশ আনতে পারে সে তো প্রত্যক্ষ দেখছি পাশের বাড়ী। হেমির মা যখন মারা গেল, দেবীকান্ত এমনি মনমরা হয়ে গেলেন, ভাবলাম, হরিনাম ছাড়া আর কিছুই তাঁর মুখ দিয়ে বেরোবেনা, অনেকদিন বেরোলও না, পুতুর পিসীমার সে কি ঝুঁকোঝুঁকি, সে তো আমি জানি, উহুঁ, দেবীকান্ত অটল, তারপরেই কি হতে কি হয়ে গেল, পুরুষের মন....

পুঁটি বাধা দিয়া বলিল, তাও বলি দিদিমা, মেয়ে মানুষ এমন হিংসুটে হতে পারে? ঐ অতটুকু পুতু, ওকেও যদি একটু সুনজরে দেখত, ছেলেটার দিকে তাকালে....

দিদিমা বলিলেন, এখনই কি হয়েছে, দুপাঁচটা নিজের হোক, তখন পুতুর দশা দেখিস। বাড়ীতে কারও তিষ্ঠোবার জো থাকবে না, যেগুলো জন্মাবে ওগুলোই কি শান্তিতে থাকবে? এরা নিজের নয় বলে যা মারধোর করে, তার চারগুণ মারধোর যদি নিজের গুলোর ওপর না করে....এই পঞ্চাশটা বছর দেখলাম তো বড় কম নয়, হাসির মার কথা মনে পড়ে, ওপাড়ার অতসীর কথা তোদেরই তো মনে থাকবার কথা, বাড়িয়ে তো লাভ নেই, উঁহু উঁহু ও হেমি, পুতুলকে টেনে নে, শেষটায় অবেলায় একটা অনাছিষ্টি...ও বউ, বউমা, ওঘরের ঝুড়ির ভেতর কমলা আছে, আনো তো একটা,.... হ্যাঁ, দাও, না-না, হেমির হাতে দাও, মা-মরা ছেলে তায় সৎমার বকুনি, এত সইবে কেন? ছাখ পুটি, কাশীতে যখন বঙ্কিমের কাছে গেলাম, তখন কাশী-গঙ্গার ওপর বজরা করে আমরা থাকতাম। বজরা জানিস তো, নৌকোর বাড়ী যাকে বলে, তাতে চাকর বাকরের অভাব বঙ্কিমের কোনকালেই নেই, জানিস, ঘাটের লোকগুলো, বিশেষ দশাশ্বমেধ ঘাটে যখন আমাদের বজরা লাগত, হাঁ করে চেয়ে থাকতো, কোন্ রাজারাজড়া বুঝি এল। রাজারাজড়া বৈ কি, বারোশ' টাকা তো বড় কম নয়, লাট সাহেবের মাইনের কথা জানিনে, কিন্তু থাকগে, যে কথা বলছিলাম, বঙ্কিমকে একদিনও দেখলাম না চাকর বাকরের ওপর একটু হুঁচুঁ করে, একটা বকুনিও যদি দেয়, বিলাতে ঢালাই করা একটা নক্সা-কাটা গ্লাস, একটা 'বয়,' বয় কাকে বলে জানিস পুঁটি, অল্প বয়সী চাকর, এমন হাসি পায় ওদের কথাবার্ত্তা শুনে, শুনেছি, সাহেবেরাও হার মেনে যায় ওর সঙ্গে ইংরেজীতে কথা কইতে, একটা আধটা পাশ তো নয়; অথচ এতটুকু যদি অহংকার থাকে...

পুঁটি বাধা দিয়া বলিল, তা থাকবে কেন, দিদিমা, দ্বিতীয় ভাগেই আমরা পড়েছি, বিদ্যা বিনয় দান করে, ছাপার কথাতো মিথ্যে হবার নয়।

দিদিমা বলিলেন, আরে বলি কি, ছাপার কথা যে এদের দেখেই লেখা রে। বাপ মা যেমন হবে ছেলে-মেয়েরাও তেমনি হবে, বইয়ের এ কথাটাও দেখে শেখা। বঙ্কিমকে দেখেছি ও ঠিক ওর বাপের মত জেদি, তেমনি ভারিক্কি।

পুঁটি বলিয়া বসিল, এই পুতুটার যে কি হবে তাই ভাবি, দিদিমা, ওরে বাপ, এমন রাগ আমি মেয়েমানুষের দেখিনি, দেখি হেমি, ওর পিঠটা কেমন লালপানা হয়ে আছে, হ্যাঁরে ওকে কি হরদমই মারে, হেমি?

দিদিমা কথা কাড়িয়া বলিলেন, সে আবার জিজ্ঞেস করতে হয়, না, বলতে হয়? সৎমা, সে আবার সতীন-পোকে ভালবাসে, মার-ধোর করে না, এ আবার কে কবে শুনেছে লা? তোদের যতসব ছিষ্টিছাড়া কথা। আপন পেটে যে ধরল না, সে বুঝবে পরের ছেলের কথা, তুই কি পাগল নাকি পুঁটি? ও হয় নারে, ওযে শত্রু সম্বন্ধ, ও হেমি, কমলার ছিবড়ে উঠোনে ফেলিস না, মা। নোংরামি আমার সহ্য হয় না, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ একটি একটি করে হাতেই গুছিয়ে রাখ, হ্যাঁ ঐ রকম করে, তুই বুঝি একটি কোয়াও খেলিনে, হ্যাঁরে, এই ছ্যাখ, লজ্জা—পুঁচকে মেয়ের আবার লজ্জা, তা না হবেই বা কেন, দেবীকান্তের আগের স্ত্রীটি ছিল লক্ষ্মী, আমায় না জিগগেস করে একটা কাজও যদি করত, ইস, ধম্‌কে দিতাম না তখখুনি; তেমনি মানত, ব'লত, তাড়াতাড়িতে হ'য়ে ওঠেনি, মা। আর এটি? বলে কিসে আর কিসে, ধানে আর তুষে, মেয়েদের লজ্জাই হচ্ছে ভূষণ, এ মাগীর একরত্তি যদি সে বালাই থাকে। সেদিন ছোট মেয়েটার চুলের মুঠি ধরে বসিয়ে দিচ্ছিলো, আমি বললাম, হ্যাঁ বউ, আর বলতে পারিনি, খ্যা-খ্যা করে উঠল,

মেয়ে মানুষের এত তেজ কি ভাল, না, থাকে? হ্যাঁ, আসতিস তেমনি পুণ্যি করে, কি বলিস, পুঁটি?

পুঁটি বলিল, নিশ্চয়ই।

দিদিমা বলিলেন, নে হেমি, এবার ওর মুখটা মুছে দে দিকিন, মা-মরা ছেলে তায় সৎমার বিষ-নজর, খেলাধুলো করতে হয় এখানে এসেই করিস, হেমি, তবু ছেলেটা যদি বেঁচে বর্ত্তে থাকে, আমার তো কম কিছু নেই....

পুঁটি উঠিতে উঠিতে বলিল, চলি দিদিমা, আবার গেনুদের বাড়ী তো বাকী রইলই, তোরা যাস্ কিন্তু হেমি, যাচ্ছিস নাকি বাড়ী এখন, তবে সবাইকে বলে দিস, আচ্ছা?

হেমি ততক্ষণে প্রতুলকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিল, বলিল, মাকে না বললে...

দিদিমা বলিলেন, এটা বুঝছিস না পুঁটি, ওদের মুখে কি আর সেই হাসি আছেরে? ওদের মুখ যে একদম থেতো করে দিয়েছে, বাড়ী থেকে যেতে দিতে যেন কত দরদ, বলে, মায়ের যে বেশী তাকে বলে ডান, জানলি? সৎমা, সৎমা।

দিদিমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যে সরু লম্বা রাস্তাটা এদিকে সান্যালবাড়ী ও অন্যদিকে হেমিদের বাড়ী রাখিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া হেমি সদর রাস্তার দিকে আসিতেছিল; এদিককার একটা জানালা খুলিয়া প্রভা বলিল, বড়দি, শিগগির এসো।

ডাকের নমুনায় হেমি সশঙ্কিত চিত্তে বলিল, কেনরে?

প্রভা বলিল, পুতুকে নিয়ে কোথায় গিছলে?

হেমি স্বভাবতঃই শান্ত মেয়ে, প্রভা-ও তেমনি। কিন্তু প্রভার এই চঞ্চলতা তাহাকে বিচলিত করিল, বলিল, বাবা আছেন?

প্রভা বলিল, না...

যাহা আশঙ্কা করা যাইতেছিল, তাহাই ঘটিয়া গেল। প্রভার পিছনে হঠাৎ যেন বোমা ফাটিয়া পড়িল: এই মেয়ে, কি হ'চ্ছে

চেঁচিয়ে ? ও, বড় বোনকে আগাম খবর দে'য়া হচ্ছে ? ধিঙ্গি মেয়ে পাঁচ-সাত খানা বাড়ী ধেই ধেই ক'রে নেচে বেড়াবে, বাড়ীর কুটোটা এদিক ক'রবেনা, এস আগে বাড়ী। ধেড়ে ছেলেকে দিনরাত কোলে ক'রে সোহাগ। যাদের বাড়ী যাওয়া পছন্দ করিনে, তাদের বাড়ীই কি যাবে নিলাজ মেয়ে ? এস আজ···

হেমি ধীরে ধীরে চোখের আড়াল হইয়া গেছে। বাঁদিকে বাঁকটা ঘুরিয়া প্রথমে বাঁশের গেটটা খুলিয়া অন্দর-মুখো হইতে যাইতেছে, এমন সময় মেজদা দপ্তরখানা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, এই হেমি, যাস কোথা ?

হেমি থমকিয়া দাঁড়াইল

মেজদা বলিলেন, আবার দাঁড়িয়ে থাকলি যে বড়, চলে আয়। বোকা মেয়ে, ওঁর গাল না খেলে পেট ভরে না।

অন্দরের গেট-লাগা একটা বেড়া ছিল ; তাহার আড়াল হইতে শব্দ আসিল : তাহ'লে আজ বাইরেই থেকো, এ বাড়ীর ভাত মিলবে না।

মেজদা হেমিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মিলবে না, ইয়ে-আর-কি, তুই বোস এখানে।

বড়দা চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। প্রতুলের বড়টা বাহির হইতে লাফাইতে লাফাইতে অন্দরের দিকে যাইতেছিল। ঠিক তাহারই পিছনে পিছনে ছোট্ট মেয়েটা আসিতেছিল, মেজদা চট করিয়া দুইটাকে ধরিয়া বারান্দার বেঞ্চের উপর বসাইয়া দিলেন, ভারী ফুর্ত্তি হয়েছে, নয় ?

ছেলেটা চাপিয়া গেল, কিন্তু মেয়েটা নিদারুণ চীৎকার সুরু করিল ; মেজদা তাহাতে আরও রাগিয়া একটা চড় বসাইয়া দিলেন ; ফলে চরম আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল। বড়দা বলিলেন, আঃ, কি করিস, জিতু ?

সাহস পাইয়া মেয়েটা কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, উম্···দুষ্টু টা···

বড়দা অতি দুঃখেও হাসিয়া ফেলিলেন ; প্রতুল তাহার দিদির হা করিয়া একটানা ক্রন্দন লক্ষ্য করিতে লাগিল। ঠিক সেই সময় অধর মুহুরী বাড়ী ঢুকিল, তিনি এই মেয়েটাকে বড় ভালবাসিতেন, তিনি বলিলেন, কাঁদিস কেন সুকু ?

সুকু কান্না থামাইল না, কিন্তু জানাইয়া দিল, মেজদা···

অধর মুহুরী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মেরেছে ? রোস্ আমি আসছি। বলিয়া দপ্তরখানায় খাতাগুলি রাখিয়া দিয়া বাহিরে আসিলেন, বলিলেন, চ···

সুকু উ-উ করিতে করিতে অধরের সঙ্গ লইল. কান্নার শান্তি হইলে সকলেই বাঁচিয়া যায় বলিয়া কেহই বাধা দিল না।

এমন সময় পিছনের দরজাটা দড়াম্ করিয়া খুলিয়া গেল। সকলেই চমকিয়া উঠিয়া একটা অমঙ্গল আশঙ্কা করিল, হেমি ও প্রতুল একে অপরকে জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু যখন একটা ভিজা গামছা হাতে প্রভা ত্রস্তেব্যস্তে প্রবেশ করিল, তখন সকলেই তেমনি আশ্বস্ত হইল। প্রভা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, যেমনি পায়খানা গিয়েছেন, অমনি বাইরের বালতিটায় গামছা ডুবিয়েই ছুট, আয় পুতু, ইস, গায়ে কত কাদা দেখেছ, বড়দা ?—বলিয়া তেমনই হাঁপাইতে লাগিল। রেগে টং, তোমরা তো সব বাইরে, আমার চুল ধরে' কি ঝাঁকুনি আমি বড়দিকে বলেছি ব'লে···বাবাকে আজ না বলেছি তো···

বড়দা মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, এইবার বলিলেন, ধ্যেৎ—

মেজদা বলিলেন, বড়দার সবতাতেই ধ্যেৎ, কেন, বলুক না ?

বড়দা বলিলেন, ও বলতে নেই।

প্রভা বলিয়া বসিল, লছমন আর ঠাকুরের ওপর কি রাগ। লছমন আর থাকছেনা এ ব'লে দিলুম।

লছমন কি একটা আনিতে দোকানে যাইতেছিল, সে তাহার নাম শুনিয়া এদিকে আসিল, বলিল, দাদাবাবু কিছু বললেন ?

বড়দা বলিলেন, তুই ওঁর কথায় কথায় জবাব করিস কেন ?

লছমন বিস্মিত হইয়া বলিল, আমি?

মেজদা বলিলেন, বলাই তো উচিত, শক্তের ভক্ত—নরমের যম হচ্ছে পৃথিবীর নিয়ম।

বড়দা বলিলেন, দোকানে যাচ্ছিস তো যা, লছমন।

লছমন চলিয়া যাইতে অশ্বিনী মুহুরী বুকে এক-গাদা কাগজ-পত্র লইয়া দেখা দিলেন। তিনি প্রবীণ মুহুরী এবং প্রতুল বিশেষ করিয়া তাঁহার আদরের বস্তু। প্রতুলের গাল দুইটা টিপিয়া বলিল, কি হ'চ্ছে সব?

প্রতুল কোলে উঠিবার জন্য দুই হাত বাড়াইল; অগত্যা এক হাতে কাগজ-পত্র চাপিয়া অন্য হাতে প্রতুলকে লইতে হইল, পরে বলিলেন, একি! জামাটা যে ভিজে! নাঃ, ছেলেটার একটা অসুখ-বিসুখ না ঘটিয়ে তোমরা ছাড়বে না দেখছি।

বড়দার মনটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল, মেজদা অনেকটা উষ্ণ-ভাবেই বলিয়া উঠিলেন, বাবা কি আজ আসবেন না নাকি?

অশ্বিনী মুহূর্ত্তে বুঝিয়া লইলেন একটা কিছু বিপর্য্যয় এই মা-হারা শিশুগুলির উপর আসিয়া থাকিবে। তবু তিনি সত্য কথাই বলিলেন: আজ তাঁর একটু দেরীই হবে। তা লছমন কোথায়, সেও তো জামাটামাগুলো এনে দিতে পারে।

মেজদা বলিলেন, লছমনের সে-সাধ্যি আছে কি না!

অশ্বিনী বলিলেন, আচ্ছা, আমি দেখছি, বলিয়া হাঁকিলেন, লছমন!

প্রভা বলিয়া বসিল, দোকানে গেছে।

অশ্বিনী বলিলেন, আচ্ছা আসুক।

মেজদা উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, আমিই যাচ্ছি।

এই যাওয়া মানে যে কি তাহা সকলেই জানিত, আর সকলের চাইতে বেশী জানিতেন বড়দা। তাই মেজদা ভিতরের দিকে পা' বাড়াইতেই ডাকিলেন, জিতু!

অশ্বিনীও তাড়াতাড়ি বলিলেন, থাক তোমার যেয়ে কাজ নেই, জিতেন। লছমনকেই বলছি।

সন্ধ্যার আর বেশী বাকী নাই, প্রায় ঘনাইয়া আসিতেছে। সান্যাল বাড়ীর বড় ছেলে ভোট আসিয়া হাঁকিল, হরিন্নুট আমাদের বাড়ী, প্রভা, সিতু, যাবিনে তোরা? চ' শিগগির, হেমি, পুতুকে নিয়ে আয়। পুতু, যাবিনে, হরিন্নুট?

প্রতুল অশ্বিনীর থুৎনী নাড়িয়া বলিল, উট!

অশ্বিনী বলিলেন, যাবি?

প্রতুল সম্মতিসূচক শব্দ ও শরীরান্দোলন করিল।

অশ্বিনী হরিভক্ত মানুষ; কীর্ত্তনে তিনি সর্ব্বত্র যোগ দিয়া থাকেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, এ ছেলে সন্ন্যাসী হবে। চ' পুতু, বড় হ'লে তোকে চিমটে, গৈরিক আর কমণ্ডলু দোব। আচ্ছা?

প্রতুল কি বুঝিয়া হ্যাঁ করিল।

ভোট বলিল, আপনারাও চলুন, বারে! সবার নেমন্তন্ন যে! বলিয়া বড়দা ও মেজদার দিকে তাকাইল।

বড়দা বলিলেন, চ' জিতু। মেজদা উঠিলেন।

সন্ধ্যার ম্লানিমা যখন ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছিল, তখন সান্যাল বাড়ার মেয়ে সন্ধ্যাপ্রদীপ ও ধূপদানী লইয়া আসিয়া সেই দুইটি যথাস্থানে রাখিয়া দিতেই, জনসমাগম মিলিয়া কেমন একটা অস্পষ্ট রহস্য বালক প্রতুলের মনে ছাপ দিয়া গেল; সে কি ভাবিতেছিল সে-ই জানে, কিন্তু যখন আবার সেই মেয়েটিই বাতাসার রেকাবি হাতে প্রবেশ করিল, তখন তাহার চিন্তাস্রোত আর একদিকে ধাবিত হইল।

এইরূপে প্রতুলের মন ও হাড় একই সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট বয়সের বহু পূর্ব্বেই পাকিয়া উঠিল। সংসারে অবিচ্ছেদ্য সুখ ও অপ্রতিহত আবদার প্রতিঘাত খাইয়া ফিরিতে পারে, সংসারে যে শুধু পিসিমাই নাই, 'মা'ও আছেন—এই নিষ্ঠুর উপসংহারে পৌঁছাইতে তাহাকে অতিশয় বেগ পাইতে হইল না। স্বচ্ছ স্বাচ্ছন্দ্যাদি এমন ঘোলাটে ও নিন্দনীয় হওয়াটা কোনক্রমেই যে অনিয়ম নহে, তাহা বুঝিতে বাধ্য হইয়া যে জিনিস সে খোয়াইল তাহা স্বাস্থ্য এবং যে জিনিস সে পাইল তাহা চিরবিরক্তি। আবার মায়ের রকমভেদও তাহার চোখে পড়িল; 'পানু' যাহাকে মা ডাকে সে ঠিক পিসিমার মতই, তবু তাহার মা আর পানুর মায়ে কত তফাৎ! পানুর মা যদি প্রতুলের মা হইত! কত অত্যাচার যে পানুরা করে! অথচ তাদের মা কিছু বলেন না, আর—তাহার মা শাসন-যষ্টি উদ্যত করিয়াই আছেন। কেবল তাড়া খাইতে খাইতে প্রতুল ঠিক করিয়াছিল, ঘটী-বাটীর মত এক একটা মা হইতে এক একরকম আওয়াজ বাহির হয়।

টুকরা-টাকরা স্নেহ-আত্তি পাইতে পাইতে প্রতুলের ধারণা হইয়াছিল, স্নেহ-আত্তি জিনিসটা টুকরাটাকরাই বেশী, একান্তভাবে একজনের কাছ হইতে পাওয়া প্রচণ্ড ভাগ্যের দরকার, তাহা বিরল। তাহাকে তাহা পাইতে হইলে এইভাবেই পাইতে হইবে। প্রতুলের পক্ষে ইহাই নিয়ম, অন্যের এই সৌভাগ্যে তাহার হিংসা হইত।

কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহার ধারণা ছিল, সকলেই তাহাকে স্নেহ করিতে বাধ্য; সেটি তাহার কাছে এত সহজ মনে হইয়াছিল যে,

সে-ধারণাটি এত সত্বর ও এমন নিষ্ঠুর ভাবে ভাঙিয়া যাইতে পারে ভাবে নাই বলিয়া আঘাতটা খুব বেশী হইল এবং কাহারও স্নেহ-যত্নেই আর আগেকার মত দৃঢ় বিশ্বাস থাকিল না। তাহার পর যখন দেখিল, ঝগড়া করিয়া তাহার মা সকলকেই তাঁবে রাখিয়াছেন, তখন মনে হইল, ঝগড়া করিয়া প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা একটি ক্ষমতা-বিশেষ। সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সকলেরই উপর দাবী নাই মনে করিয়া নিজেকে যতই সে ঘা খাইয়া শিথিল করিতে লাগিল, মেজাজের খিটিমিটি ততই বাড়িতে লাগিল; কাহার প্রতি রাগ প্রকাশ করিবে বুঝিতে না পারিয়া সকলেরই উপর তাহার আক্রোশ জন্মিয়া ও ফাটিয়া পড়িতে লাগিল এবং এ সম্বন্ধে স্থাবর ও অস্থাবর, জড় বা চেতন পদার্থের পার্থক্য তাহার কাছে রহিল না। শৈশব ভরিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার বিরক্তি প্রকাশের পাত্রাপাত্র জ্ঞান ছিল না। এই কারণে বাড়ীতে ও বাহিরে বাড়ীর লোকদের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। মানসিক এই অসন্তোষ একটা অহেতুক ও অনির্দ্দিষ্ট কামনার জন্য সতত উদগ্র হইয়াই থাকিত। তাই অতি শৈশব হইতেই এই অপরিতৃপ্তির ভিতর দিয়া প্রতুলের মন ও হাড় পাকিয়া উঠিল। কিন্তু অপরিণত অপরিপুষ্ট অসুস্থ পাকা হাড় ও মনের উপর ঘটনাশ্রেণী কোনো বিশেষ নিয়ম না মানিয়াই ঢেউয়ের শৃঙ্খলার মত উঠিয়া পড়িয়া তাহাকে ভাঙিয়া চুরিয়া গড়িতে লাগিল, কিন্তু এই অপরিতৃপ্তির অসন্তোষের গতিস্রোত বন্ধ হইল না।

বিবাহের পর হইতে বিমলা তাহার স্বামীর সহিত এক শয্যায় অভিমান করিয়াই শোয় নাই, শুইবে-না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। কিন্তু সতীনপোদের দিকে তাকাইয়া বিমলার মনে ঈর্ষ্যাজনিত একটা নারী-সুলভ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত এবং তাহারই উপর যুক্তির প্রলেপ দিয়া ভাবিত, সংসারে আগুন ধরাইবার যে-ব্রত সে গ্রহণ

করিয়াছে, তাহার পরিপূর্ণতায় সন্তানও চাই, মাতৃত্বও চাই। তবুও অন্তরের জ্বালা ও ঘৃণাটা মাঝে মাঝে তাহাকে এতই অভিভূত করিয়া ফেলিত যে, নিজেকে এ-বিষয়ে সঙ্কুচিত না করিয়াই পারিত না। দেবীকান্তের দৈহিক ব্যগ্রতা মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেও, ক্ষণিকের এই সম্ভাবনা গ্লানিতে পরিপূরিত হইয়া উঠিত বলিয়া প্রতিঘাত খাইয়া যেন ফিরিয়া যাইতেন। যুক্তি দিয়া বলিতেন, ঐটুকু বাদও যদি দেই, বিমলাকে অতি নিকটে যে টানিয়া লইতে পারিতেছি না, ইহা অন্যায়ও বটে এবং নিজের দুর্ব্বলতার চিহ্নও বটে; এই অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার এতটা বিকৃত করিয়া দেখিতেছি, তাহার কারণ আমার নিজের সহজ স্বভাবটুকু হারাইয়া ফেলিয়াছি, নতুবা এইরূপে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য বিমলার সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়াছে নাকি? বিমলার কি দোষ? দোষ যদি কাহারও থাকে, তবে সে তাঁহার নিজের; যদি স্মৃতির আঁটুনি এতই বেশী ছিল তবে আদৌ বিবাহ করিলাম কেন? করিলামই যদি তবে অনাদর দিয়া বিমলাকে প্রত্যাহার করার মানে অক্ষালনীয় নিষ্ঠুরতা। লজ্জা যে-টুকু ছিল সে-টুকুতো নিজের দুইপায়ে নির্লজ্জের মত মাড়াইয়া দিয়াছেন, আর এখন লজ্জা করিলে চলিবে কেন? তবে হ্যাঁ, তাঁহার দিক হইতে আর কোন বাধা থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু অন্যপক্ষের তেমন সহযোগিতার ইচ্ছাও তো চোখে পড়ে না। বরং বিমলার কথাবার্ত্তায় ক্রমেই যে-প্রকার ঝাঁঝ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহার বয়সকে যে এই যুবতীটি বিদ্বেষই করে, দেবীকান্তের ধারণায় তাহা ধরা পড়িয়াছিল; দ্বিতীয় বিবাহে ছেলেদেব কাছে তাঁহার যত লজ্জা আছে তাহার চাইতে কম লজ্জাবোধ বিমলার কাছে ছিল না; কাজটা করিয়া ফেলিয়া দেবীকান্তের ঘরে-বাইরে সঙ্কোচের অবধি ছিল না। বিশেষ বড় ছেলেটি যেদিন গরজ করিয়া তাহার পরলোকগত মাতার একটি এন্‌লার্জড পেন্সিল ড্রইং আনিয়া বড়ঘরের মাঝখানেই টাঙাইয়া দিল, সেদিন হইতে এই দম্পতির একটা মানসিক লড়াই

চলিতেছিল। কিন্তু তাহার ফল এই হইল যে, বিমলা একদিকে দেবীকান্তকে এই মরা স্মৃতি হইতে ছিনাইয়া আনিতে যেমন ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিল, দেবীকান্তও তেমনি ইহাকে চাপা দিবার জন্য স্নেহের মাত্রাটা বাড়াইয়া দিলেন। এই আদরের বাড়াবাড়ি যদিও পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকিল, তবুও পরস্পরের প্রতি খানিকটা আকর্ষণ না জন্মিয়াও পারিল না। সেটুকু কোন প্রকারে চাপিয়া টিপিয়া সকলের আড়ালে লজ্জা বাঁচাইয়া প্রকাশ করিবার জন্য উভয়ের মন উদগ্র হইয়া রহিল। কিন্তু বিমলা তবুও নিজের রাগটা অত সহজে দমিত করিতে পারিতেছে না বলিয়া দেবীকান্তের ব্যাকুলতাটাই প্রকাশ্য হইয়া পড়িত বেশী।

বড়ঘরে দেবীকান্ত বিস্তৃত ও প্রশস্ত খাটটায় চিরকাল একা শুইয়া থাকেন, ইহা তাঁহার অন্যতম বিলাস। ঘরে আর তিনটি তক্তপোষ ছিল। উত্তর দিকটা জুড়িয়া পূর্ব্ব-পশ্চিম-ব্যাপী দুইখানা তক্তপোষ পাশাপাশি থাকিত; তাহাতে বিরাট ফরাসের মত বিছানা পাতিয়া বিমলা ও কনিষ্ঠ দুই তিনটি ছেলেমেয়ে শুইত। উপরে তেমনি বিরাট এক মশারী টাঙানো থাকিত। বিমলার জীবনে অবসাদ কুঁড়েমিতে পর্য্যবসিত হওয়ায়, এই ছেলেপুলেগুলি যার যার ক্ষেত্রে প্রকৃতির ডাকে সমস্ত অপকর্ম করিয়া বিছানা সিক্ত ও দুর্গন্ধ করিয়া রাখিত; বিমলার অকাতর ঘুম না ভাঙিলে ইহাদের প্রাপ্য মুষ্টিযোগও মিলিত না। এই বদ-অভ্যাসের একমাত্র মহৌষধ যে ছেলেমেয়েগুলিকে একবার সময়মত উঠাইয়া স্বপ্নের দুষ্কর্ম্ম হইতে বাঁচানো, তাহা বিমলাকে কেহ বুঝাইতে স্পর্দ্ধা করিলে যে কাণ্ড ঘটিত, তাহাতে আর কেহ উহার পুনরুক্তি করিতে সাহস পাইত না। দেবীকান্ত দেখিয়াও দেখিতেন না, কেন না, সহধর্ম্মিণীকে কোনো সহ-কর্ম্মে নিয়োজিত করিবার সময় তাঁহার হয় নাই।

সে-রাত্রে ঘরে ফিরিতে দেবীকান্তের দেরী হইয়া গেল; দেরী মানে বারটা বাজিয়া গিয়াছিল; পাশার আড্ডাটায় যোগদান

আজকাল আর নিয়মিত হইত না, নিজের দপ্তরখানায়ই গুটি কয়েক মক্কেল ও আলাপী ভদ্রলোক জুটিলে সেখানেই রাতের অনেকটা কাটিয়া যাইত। তেমনি আজও অখিল কবিরাজ জুটিয়া গেলে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে আলাপটা এমনই ঘোর হইয়া উঠিল এবং কবিরাজের স্বরচিত গানে উহা এতই সরস হইয়া উঠিল যে, রাতের বিলম্বের দিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না। শেষটায় কবিরাজ গান গাহিয়া ও তত্ত্বকথায় পরিশ্রান্ত হইলে এবং কালিদাস পণ্ডিত রাতের অজুহাত দেখাইলে, দেহ রক্ষা করিবার জন্য, যাঁহারা আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যকে এই মাত্র মায়াময় বলিয়া প্রচার করিলেন, তাঁহারা যে যাঁর গৃহের দিকে পা বাড়াইলেন। ভোজন পর্ব্বটা সভা বসিবার বহু পূর্ব্বেই সমাধা হইয়া গিয়াছিল, এখন সে বালাই ছিল না।

দেবীকান্ত যখন ঘরে ঢুকিলেন, তখন ঘরে সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল মনে হইল। তাকিয়া ঠেস দিয়া হইলেও, একভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া বাঁ দিকটায় কি রকম ঝিঁ ঝিঁ ধরিয়াছিল, তাই হাঁটিতে খানিকটা ন্যাংচাইতে ছিলেন। খাটের মশারী ফেলানো ছিলনা; উঁচু খাটে উঠিতে গিয়া ঝিঁ-ঝিঁর জায়গাটা ধরিয়া একটা 'উঃ' করিয়া উঠিলেন।

বিমলা জাগিয়াই ছিল। মনে নাকি আজ নানারকম ঝড় বহিতেছিল, তাই ঘুমের খানিকটা বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। দেবীকান্তের আগমনে কি একটা মনে করিয়া তাহার বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছিল, সে কিছুতেই উঠিতে পারিল না। দেবীকান্ত যখন উঃ করিয়া উঠিলেন, বিমলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল এবং পরক্ষণেই মশারীর বাহিরে আসিয়া পড়িল, আঁচলটা গায়ে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, কি হ'ল ?

দেবীকান্ত মনে মনে খুসী হইয়া বলিলেন, তুমি জেগে গেলে ?

বিমলা বলিল, আর কিছু না হোক তোমার মশারীও তো ফেলতে হবে। কিন্তু হয়েছে কি ?

দেবীকান্ত বলিলেন, কিছু না, একটু ঝিঁ ঝিঁ লেগেছে।···

বিমলা বলিল, হোক, শুয়ে পড় দেখি···

দেবীকান্ত অভূতপূর্ব পরিবর্ত্তিত সুরে আশ্চর্য্য না হইয়া পারিলেন না। কলের মত আদেশ পালন করিলেন, কিন্তু সযত্নে ও ধীরে মশারী গুঁজিয়া দিয়া বিমলা যখন মশারীর ভিতরে বসিয়া দেবীকান্তের পা নিজের কোলের উপর টানিয়া লইল, দেবীকান্তের বিস্ময়ের অবধি রহিল না, দেহতন্ত্বের রেশ কানে বাজিতে থাকিলেও এই ব্যাপারে যে প্রচুর আনন্দ পাইলেন, তাহার ভিতর কোথায় সামান্য একটু ব্যথাও যেন টনটনাইয়া উঠিল। দেবীকান্ত বাধা দিলেন না, বিহ্বলতাবশতঃ সমস্ত শরীরে কয়েক মুহূর্ত্ত জড়তা আসিয়া গেল। তাহার পরেই একটা দৈহিক কম্পন অনুভব করিলেন। বিমলা বলিল, একি তুমি কাঁপছ নাকি ?

দেবীকান্ত জবাব দিলেন না, দিতে পারিলেন না।

বিমলা শঙ্কিত হইয়া বলিল, এত কাঁপছ যে ? বলিয়া দেবীকান্তের কপালে হাত দিবার জন্য খানিকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়া এদিকে আসিতেই এবং সঙ্গে সঙ্গে দেবীকান্ত সেই উদ্যত হাতখানি টানিয়া লইতেই অপ্রস্তুত বিমলা দেবীকান্তের বুকের উপর পড়িয়া গেল; আবেগে দেবীকান্তের মুখ দিয়া কোন কথা সরিল না। শারিরীক ছন্দটা যে কি প্রকার উন্মত্ততায় নাচিতেছিল, বিমলার কান তাহা টের পাইল। একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল, তোমার শরীর কি ভাল নেই ?

দেবীকান্ত সে কথার জবাব দিলেন না, বলিলেন, আমাকে কি তুমি কোন দিনই ভালবাসতে পারবে না গো !

বিমলার কাছে ইহাও অপ্রত্যাশিত ; তবু প্রত্যুত্তর করিল না।

দেবীকান্তের উৎস তখন খুলিয়া গিয়াছে, তিনি বলিলেন, চিরদিনই কি এমনি ঘৃণা করে কাটাবে, একটু দয়া, একটু অনুকম্পা···

বিমলা দেবীকান্তের মুখ চাপিয়া ধরিল, কিন্তু কিছুই বলিল না।

দেবীকান্ত অধীর আগ্রহে বিমলাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন, বিমলা নিজেকে ছাড়াইয়া লইল না, দেবীকান্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

বিমলাও আজ নিজেকে সকল রকমেই চরিতার্থ মনে করিতেছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া এমন একটা নারী-সুলভ উল্লাসের নর্ত্তন সুরু হইয়াছিল যাহা সে জীবনে কোনোদিন অনুভব করে নাই। কিন্তু তবুও কেমন একটা অবর্ণনীয় লজ্জা তাহাকে জড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে চায়; তৃপ্ত, নন্দিত, উদ্ভাসিত মুখখানার দৃষ্টি ঘরের আসবাব ও শিশুগুলির দিক হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। আসে সত্য, কিন্তু পরদিন ভোর বেলায় গভীর ঘুম হইতে যখন জাগিল, তখন নিজের কাছে এ জীবন আর তেমন বিস্বাদ লাগিল না, যাহা কাম্য ছিল তাহা যেন পাওয়া হইয়া গিয়াছে।

বিমলার চরিত্রে ঐটুকু মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিল। এতদিন অনাগত ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ থাকিয়া সে-যেমন চলিতে চাহিয়াছিল, আজ যেন তাহাতে কোথায় একটা বাধা আসিয়া জুটিতে লাগিল; ভবিষ্যতের সহিত অত ভীষণ শত্রুতা করিতে তাহার যেন মন উঠিত না; বরং মনে হইত, ভবিষ্যতে কোথায় যেন একটা অতি প্রিয় সৌধ গড়িয়া উঠিতেছে, যাহাকে অবহেলা করিবার সাধ্য তাহার নাই—এই অনিশ্চিত সম্বন্ধে নিজেকে সংযত করিতে গিয়া সে অনুতপ্ত হইল না বটে, কিন্তু লজ্জিত হইল; এবং ঐ লজ্জাই বিমলার চরিত্রে একটা পরিবর্তন আনিল; তাহার আভাস একমাত্র যাঁহার কাছে স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল, তিনি দেবীকান্ত; নতুবা সংসারে যে বিভীষিকার আমদানী হইয়াছিল, তাহা তেমনি জাগরূক ছিল। তাহাতে লক্ষনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিল না।

পশ্চিমদিকের লিচুগাছটার নীচ দিয়া পাকা সদর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে; রাস্তার পশ্চিমে বাড়ুয্যেদের একান্নবর্ত্তী পরিবার। এগারদিন পূর্ব্বে উপযুক্ত পুত্র ও বৃদ্ধ স্বামীর কাছে খবর পৌঁছিয়াছিল,

কাশীতে বাড়ুয্যে-গিন্নী স্বর্গে রওনা হইয়া গেছেন, কেবল পিণ্ডদানের অপেক্ষায় আছেন। ছয়টি ভাই মিলিয়া মাথা মুড়াইয়া নির্ব্বিঘ্নে মায়ের শান্তির ব্যবস্থা করিয়া দিল ; সেই উপলক্ষ্যে লুচি আর দইয়ের যে প্রাচুর্য্য ঘটিল, প্রতুলদের বাড়ীও তাহাতে ভাগ বসাইবার আহ্বান পাইল। নিমন্ত্রণে প্রতুলের উৎসাহের সীমা থাকিত না, এইবারেও ছিল না ; কিন্তু প্রতিবার নিমন্ত্রণ বাড়ী হইতে একটা না একটা কেলেঙ্কারী করিয়া আসে বলিয়া সবাই প্রতুলের এই আগ্রহে সশঙ্কিত হইয়া উঠিত। কিন্তু ঠেকাইয়া রাখা? সেও তেমনি বিপদ এবং একই প্রকার একটা কিছু লজ্জাকর ব্যাপার ছেলেটা করিতই। তাহার উপর তাহার বয়স আজকাল বাড়িয়া প্রায় পাঁচের সীমা পার হয় হয়। হাঁটিয়া অনায়াসেই ঐটুকু পথ যাইতে পারে।

তোকে যেতে হবে না, পুতু, বিমলা বলিল।

সকলেই কাপড় পাল্টাইয়া লইতেছিল, এক মুহূর্ত্তের জন্য সকলে থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রতুলের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

বিমলা বলিল, না তোকে যেতে হবে না, আবার একটা অপকর্ম্ম করে আসবি বৈ তো নয়?

কথাটা মিথ্যাও নয়, অবহেলারও নয়। প্রতুল কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল ; সৎ-মা মারিলেন, হৈ চৈ পড়িয়া গেল। প্রতুল উহারই মধ্যে ন্যাংটা অবস্থায় গোঙাইতে গোঙাইতে বাহির হইয়া গেল দেখিয়া প্রভা চুপি চুপি একটা ছোট কাপড় নিজের কাপড়ের আড়ালে লুকাইয়া সরিয়া পড়িল।

কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ব্ব-পূর্ব্ববারের মতই সফল হইল। প্রতুল নিমন্ত্রণ-সভায় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অভিমান করিল এবং ঠিক যেই সময়টিতে খাইবার ডাক পড়িল, সেই সময়টিতে সে দরজার একটি ধার এমনই জোরে চাপিয়া ধরিল যেন এই ব্যাপারে তাহার অসম্মতির অবধি নাই। বাড়ুয্যে পরিবারের তৃতীয় সন্তান প্রতুলের অনেক আবদার সহ্য করিতেন। বহু প্রকারে চেষ্টা

করিয়াও তিনি প্রতুলকে সম্মত করাইতে পারিলেন না, বড়দা মেজদা সকলেই হাঁপাইয়া উঠিলেন। বিরক্ত হইয়া তাঁহারা যখন শেষাশেষি বসিয়া গেলেন ও পরিবেশন আগাইতে লাগিল, তখন সে আসিয়া হাজির, কিন্তু ডাকিলে সে কিছুতেই আসিবে না।

মেজদা বলিলেন, থাক তোরা খা'।

তবুও সকলেই এক-একবার নিজের নিজের সঙ্গে প্রতুলকে খাইতে বলিল। বাড়ীর কর্ত্তা আসিয়া বলিলেন, ছি বাবা বোসো। কিন্তু কাকস্য..., প্রতুল মুখ ফুলাইয়া ও ঘাড় বাঁকাইয়া রহিল। তারপর কখন কি করিয়া একসময় বসিয়া গেল। বসিয়া যখন গেল, খাওয়া লইয়াও তেমনি টালবাহানা চলিতে লাগিল। পাতে মাছ থাকিতে মাছ চাই, লুচি দুইখানা থাকিলে চারখানা চাই, অর্থাৎ পাতে স্তূপীকৃত হইয়া জিনিস থাকিয়া গেল। তারপর মিষ্টান্ন। তখন প্রতুল রসগোল্লা, পানতোয়ার জন্য উদগ্র হইয়া উঠিলে সকলেই সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। সে কিছুতেই উঠিবে না, যেন এক বিষম দ্বন্দ্ব আর কি! মহাকোলাহলে লজ্জায় পথ কাটিয়া মেজদা-তাঁহারা তাহাকে যখন বাড়ীতে আনিয়া ফেলিলেন, তখন প্রতুলের সর্ব্বাঙ্গে ধূলা ও এঁটো এবং...

বিমলা হাঁকিয়া উঠিল, তখনই ব'লেছিলাম কানে তো যায় না মোটে? নাও এখন, এমনি বসে থাক···তেমনি ছেলে বাবাঃ, এই এই প্রভা, কোথা ছুটছিস, ফের সর্দ্দারি করবি···

প্রভা রাগিয়া বলিল, বা-রে, ওগুলো ধুতে হবে না বুঝি?

বিমলা তাহার দিকে যাইতে যাইতে বলিল, কী আমার ওপর কথা? বলিয়া প্রভার চুলের মুঠি ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, ধোয়া তো হবেই না, যে ধুতে যাবে তারও রক্ষে থাকবে না। এই হেমি, সরলি ওখান থেকে?

মেজদা তেমনি জোরে বলিলেন, যা তো হেমি, ওকে ধুয়ে নিয়ে আয়, আমিও দেখব, কে তোকে ছোঁয়...

তারপর এক কুরুক্ষেত্র। য়্যাঁ, বিমলা বাড়ীর গিন্নী নয়? এদের ওপর সে কেউ নয়? বাড়ীর একটা ছোকরা তাকে এমনি নিত্য শাসাবে? একটা ব্যবস্থা কি হবে না মা-খেগোদের? আসুন আজ বাড়ীতে···বলিতে বলিতে বিমলা রাগের মাথায় কী যে করিল আর কী যে না করিল তাহার হিসাব নাই; বাহিরে হরিণ-সিঙয়ের উপর কাহার একটি কাপড় টাঙানো ছিল, সেটি ত্রস্তে ও সজোরে টানিতে গিয়া ছিঁড়িয়া ফাৎ ফাৎ হইয়া গেল এবং তাহার পরেই সেটি একটি দণ্ডায়মান 'মা-খেগোর' ঘাড়ে আসিয়া পড়িল; সে তাহা ফেলিয়া দিতেই বিমলা আর একবার তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল এই বলিয়া যে, কোন জিনিসেই ইহাদের মমতা বোধ নাই, কেননা গৌরীসেন টাকা জোগায়, ইহাদের কি, ইহারা শুধু গিলিতেই এই সংসারে আসিয়াছে, ছেঁড়া কাপড়ে যে কাঁথা হয়, এইটুকু জ্ঞানও ইহাদের নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ততক্ষণে শ্রোতার দলও কমিয়া গিয়াছে, প্রতুলের হাত-পা ধোয়া হইয়া গিয়াছে এবং হেমির কোলে (অত বয়সেও) পানুদের বাড়ী আসিয়া পড়িয়াছে। পানুদের বাড়ী তখন আর দুই চারিটি ছেলে জুটিয়াছে। তাহারা হৈ চৈ করিয়া উঠিল, প্রতুল পরণের কাপড় নষ্ট করিয়াছে বলিয়া ইঙ্গিত করিল। হেমির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, প্রতুল হেমির ঘাড়ে মুখ লুকাইল, বয়সীরা কেহ মুখ টিপিয়া কেহ খোলাখুলিই হাসিয়া উঠিল। এক প্রভা প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, প্রথম যেকথা তুলিয়াছিল তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই বলিল, তুই তো বিছানায় মুতিস্ রোজ।

আর পুতু?—সেই ছেলেটিই জিজ্ঞাসা করিল; আর সবাই হাসিয়া উঠিল।

প্রভা বলিল, বেশ করে, তোদের বিছানায় তো করে না?

পানু বলিল, তবে বলিস কেন?

প্রভা বলিল, বলবই তো, একশোবার বলব। বলিয়া এই দুষ্কর্ম্মকারীরা তেঁতুলতলায় কি একটা অখাদ্য খায় এইরূপ একটা শ্লোকের উল্লেখ করিল।

তখন তাহার পাল্টা জবাব দিল পানুরা, নেমন্তন্ন বাড়ী গিয়ে কাপড় নষ্ট করে—য়্যাঃ রাম্-রাম্! হাভাতে, রাক্ষস, খেতে পায় না বাড়ীতে। ইত্যাদি। সে এক মহা হল্লা। পানুর ঠাকুমা এক ধমক দিয়া বলিলেন, যা, তোরা বাড়ী যা, কী কুঁদুলে গো!

বাহির হইয়া আসিতে আসিতে প্রতুল কি মনে করিয়া জিভ বাহির করিয়া কাহার উদ্দেশে ভ্যাংচাইল ও একটি অবজ্ঞা ও ঘৃণাসূচক শব্দ করিল।

হেমি বলিল, ছি, পুতু!

প্রত্যুত্তরে প্রতুল হেমিকে মারিল, হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল। প্রভা দিদির এই অবস্থা দেখিয়া বলিল, বড়দি, দাও নাবিয়ে ওকে, যেমনি ছেলে!

প্রতুল এইবার স্পষ্টভাবে প্রভাকে বলিল, হারামজাদি, আর সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাংচাইল।

প্রভা চটিয়া বলিল, তবেরে ছেলে, রোসো, মেজদাকে না বলেছি তো, মেজদা! অ মেজদা!

মেজদা বাহির বাড়ীতে ছিলেন: এই চ্যাঁচাস কেন?

প্রভা তাহার নালিশ জানাইল।

মেজদা অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, বলিলেন, তাই নাকিরে হেমি?

হেমি প্রত্যুত্তর করিল না।

প্রভা বলিল, আমি কি মিথ্যে বলছি? ওবাড়ী থেকে আসতে বড়দিকে কী ভীষণ মারছিল, বড়দি তো বলে না কিছু, আমি ধমকেছি, তাই কিনা আমায় বলে, হারামজাদি!

মেজদা প্রতুলের কান দুইটি ধরিয়া বলিলেন, ব'লেছিস?

কোনো জবাব আসিল না।

আর ব'লবি?

কোনো হাঁ না নাই।

মেজদা সহিতে না পারিয়া প্রতুলের কানের পাশের চুল টানিয়া বলিলেন, আর ব'লবি?

প্রতুল আকাশ ফাটাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, ও পিচিমা গো!

সেজদা হাঁকিল, মেজদা!

মেজদা কাছেই ছিলেন, বলিলেন, কেন রে?

সেজদা বলিল, আমার বই কেড়ে নিচ্ছে পুতুটা। বলিয়া প্রতুলকে বলিল, দে—আমার বই—ছাড়্...

ততক্ষণে মেজদা আসিয়া পড়ায় বলিল, দিচ্ছেনা।

প্রতুল ছাড়ে না।

মেজদা বলিলেন, ও বই দিয়ে তুই কি করবি পুতু, ও যে দ্বিতীয় ভাগ। সেজদার মত বড় হও, দ্বিতীয় ভাগ এনে দোব—কেমন?

প্রতুল তবুও ছাড়ে না। সেজদা আবার বলিল, দিচ্ছে না, বা রে।

মেজদা একটু হাসিলেন, বলিলেন, ছেলের প্রথম ভাগই শেষ হ'লনা, দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি, ওটা শেষ কর আগে, বিদ্যেসাগর।

প্রতুল তেমনই অবস্থায় নিজের প্রথম ভাগের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল, ওটা ভালো না। বলিয়া আর একবার সেজদার বইখানায় হেঁচকা টান মারিল, সেজদাও ছাড়ে না।

মেজদা আবার বলিলেন, তোর তো ও বই-ই শেষ হয় নি, দেখি···বলিয়া প্রথম ভাগখানা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, এই তো আর ক'টা পাতা বাকী, পড়ে ফেল চট্‌পট্‌, নতুন বই এনে দোব, কেমন ?

কিন্তু ততক্ষণে উভয়েই টানাটানি করিতে করিতে হাতের ব্যথায় পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং উভয়েই মুখে একপ্রকার শ্রম-শব্দ করিতেছে। মেজদা বলিলেন, ছাখ দেখি, কথা শোনে না, অবাধ্য কোথাকার, এই পুতু। ছাড় ছাড়, বলিয়া মেজদা ছাড়াইয়া লইলেন, সেজদা বই পাইয়া স্থান ত্যাগ করিল, আর প্রতুল—পরাজিত, অপমানিত প্রতুল, সেকেণ্ড কয়েক গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া নিজের প্রথম ভাগখানা দুই হাতে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। মেজদা ভীষণ ক্রোধে প্রথমটায় স্তম্ভিত হইলেন, পরে পাশের দুই এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, দেখেছ দেখেছ, ছেলের জেদ দেখেছ, বলিয়া প্রতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ছিঁড়লি যে ? য়্যা ?

জবাব কে দিবে ? জবাব দিবার জন্য আর প্রতুল এই কাজ করে নাই। সে ছিন্ন পুস্তকের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া অনিবার্য্য মারের আশঙ্কায় হাতের উল্টা পিট দিয়া ডান চোখ ঘষিতে লাগিল। কিন্তু মেজদা মারিলেন না। ছেঁড়া বইখানা উল্টাইয়া লইয়া বলিলেন, যা তোকে পড়তে হবে না, আজ থেকে শিশুর সঙ্গে যাস। বলিয়া চলিয়া গেলেন। শিশুর ব্যাপারটা সে যাহা শুনিয়াছে তাহাতে পাঠচ্ছেদের খানিকটা ভয় না হইয়াই পারে না। শিশুর ইতিহাস একটা দুঃখের ইতিহাস।

তাহাদের পাড়ায় একেবারে নদীর ধারে একটি ছোট্ট পরিবার আছে। সংসারে কর্ত্তা সামান্য চাকুরীই করিতেন, কিন্তু অমর নহেন বলিয়া একদিন এমনই সময়ে মারা গেলেন যখন কর্ত্রী সর্ব্বশেষ উপহারটি পেটেই রাখিয়াছেন এবং তদুপরি আরও তিনটি সন্তান বড় করিয়া তুলিতেছেন মাত্র। গর্ভস্থিত দুর্ভাগাটি আরও দুর্ভাগ্যবশতঃ

কন্যা হইয়া জন্মিবে বলিয়া নির্দ্ধারিত, কেননা পরে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে; আর তিনটি সৌভাগ্যবশতঃ পুরুষ সন্তান বটে, কিন্তু ছোট ছেলেটির তখন নির্ব্বিকল্প অবস্থা। সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য বলিয়া কোন সংস্কারই জন্মায় নাই, তাহার জ্যেষ্ঠটি পিতৃদায়ের কষ্টটুকু বুঝিল, সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বিশু সকলই বুঝিল, কিন্তু অনেক কিছুই অস্পষ্ট থাকিয়া গেল; আর যিনি নিঃসংশয়ে অন্ধকারের প্রতিটি রন্ধ্র চক্ষু ও হৃদয় দিয়া জানিলেন তিনিই কর্ত্রী; কাঁদিতে গিয়াও নীরবে চোখ মুছিয়া ফেলিলেন এবং যে অশ্রু ঝরিল না তাহাই বুকে জমাইয়া শক্ত করিয়া ফেলিলেন। আয়ের পথ বন্ধ হইল বটে, কিন্তু বহু আশা করিয়াই প্রথম ছেলে দুইটির পাঠের ব্যবস্থা কায়েম রাখিলেন। নৈরাশ্যের মধ্যে একমাত্র আশার যে সূত্রটুকু লইয়া মা ভবিষ্যৎ জপিতে ছিলেন তাহা ঐ সর্ব্বজ্যেষ্ঠটি। যেমনই ধীর ও শান্ত, পড়াশুনায় তেমনই পটু ও ধ্রুব। দ্বিতীয় যীশু বড়টির অনুসরণ করিয়া মায়ের কাজে সাহায্য করিতে লাগিল বটে, কিন্তু পাড়ার আর পাঁচটা অবস্থাপন্ন ছেলের সহিত মিলিয়া মায়ের এই গরীবানার প্রতি মাঝে মাঝে নাক সিঁটকাইত, 'কাহারও ছোট নয়' ইহা প্রমাণ করিতেই পাড়ায় ডাংগুলি আর মার্ব্বেলে হাত পাকাইয়া তুলিল। ইহার কনিষ্ঠটির প্রতি তাকাইয়া মায়ের কালো মুখখানা আরও মলিন হইয়া আসিত। শিশু তাহার নাম। এই অসহায় দুর্ব্বল অবোধ ছেলেটার চিন্তায় অকস্মাৎ অন্ধকার যেন পুঞ্জীভূত হইয়া আসিত। মায়ের এই স্বাভাবিক মঙ্গল অমঙ্গল চিন্তা পরবর্ত্তীকালে যে সত্যিই এমন চির দুশ্চিন্তায় পরিণত হইতে পারে, কে জানিত?

মা মুড়ি ভাজিতে লাগিলেন, পাড়ায় বিক্রী করিবার জন্য; দুই একজন সহানুভূতি দেখাইতে আসিল বটে; কিন্তু মুড়ি ভাল হয় না বলিয়া অথবা চাল-চাল থাকিয়া যায় দেখিয়া গ্রাহক সংখ্যা কমিতে লাগিল। বাড়ীতে বেলগাছ ছিল দুইটা, বাহিরের বেল পাড়ার সেই

অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরাই নদীতে স্নান করিতে যাইবার কালে অনর্থক হুজুগের মাথায় জোর করিয়া ক্ষুধার উদ্রেক করিয়া পাড়িয়া লইত ; সচকিত মা হা হা করিয়া ছুটিয়া আসিতেন। লজ্জার বালাই নাই, জাতের বড়াই তিনি কোনোদিনই করেন নাই ; রূপ লইয়া অহঙ্কার করিবার কারণও তাঁহার ছিল না, করিতেনও না, কাজেই সজ্জার আভিজাত্যের মধ্যে ছিল এক চিল্‌তে ছেঁড়া থান কাপড়। তাহা লইয়াই ঐ মূর্ত্তিতে বাহির হইয়া আসিলে বাহিরের ছেলের দল কৌতুক বোধ করিত, কৌতুকের মাত্রা বাড়াইবার জন্য বাল-সুলভ কিন্তু নিষ্ঠুর মন্তব্য প্রকাশ করিত এবং যে যত কঠিন বলিতে পারে, তাহারই কৃতিত্ব বেশী থাকিত। বিশু ওরা লজ্জায়, সঙ্কোচে দুঃখে মরিয়া যাইত ; বিশু তাই বড় একটা কাহারও সহিত মিশিত না ; নিজের বই লইয়া ঘরে বসিয়াই দিন কাটাইত, আর, এই সকল রূঢ় মন্তব্যের পাশ কাটাইয়া স্কুলে যাওয়া-আসা করিত। মেজটা এই লইয়া অন্যান্য ছেলেদের সহিত যেমন তর্কাতর্কি করিত— তর্কাতর্কি তো ভারী।—ওরা বলতো কিপ্‌টে—বেনে, ও বলত বেশ—বেশ—তোদের কি? এই রকম তর্কাতর্কি করিয়া রাগ করিয়া বাড়ী আসিত কিন্তু ছেলেগুলির উপর যত-না রাগ হইত তাহার চাইতে ঘৃণা হইত মাকে বেশী। মা এ সকল গ্রাহ্য করিতেন না। দিনরাত পাহারা দিয়া গাছের বেল, আম, কাঁঠাল, কাগজী নেবু, লিচু, শক্তহাতে ছেলেমেয়েদের পচা গলা একটা আধটা অগ্রাহ্য ফল খাইতে দিয়া বাকীটা, মানে, সবটাই বেচিয়া দিতেন। কাঁচা আম এদিক ওদিকে কুড়াইয়া আমসী করিতেন, কুল সংগ্রহ করিয়া শুখাইয়া রাখিতেন এবং পাশের জঙ্গলটা হইতে নিজে যেমন চালতে জোগাড় করিতেন, ছেলেদের তেমনি মাছ মারিবার উৎসাহ দিতে নিজেই 'চার' সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। সকল দিক হুঁসিয়ারী করিতে কণ্ঠ যথাসম্ভব চড়িত বলিয়া কণ্ঠের সকল রগ টান হইয়া যাইত, আর, দুশ্চিন্তায় কপালে একদিকে যেমন গভীর দাগ পড়িতে

লাগিল, অন্যদিকে তেমনি মাথার চুল উঠিয়া যাইতে লাগিল। নিজের প্রাণপাত পরিশ্রমে ছেলেরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কিছু একটা উপায়ে খানিকটা লাঘব করিত। খাইতে বসিয়া হয়তো মাছ নাই, 'মাছ-খেকো বাঙ্গালী সন্তান' বাঁকিয়া বসিলে, মা বলেন, পাশের পুকুরটায় একটা ছিপ নিয়ে বসলেই পারিস?

হ্যাঁ, মাছ মারতে যাবনি?

ওমা, দোষ কি রে?

মাছ বুঝি সব্বাই মারে?

সব্বাই কেন মারবে রে, আমরা যে গরীব, বাবা।

গরীব! কথাটা তাহারা এত শুনিয়াছে যে, এই শব্দটার প্রতি তাহাদের বিদ্বেষ যেমনই সীমাহীন, ইহার প্রতি সশ্রদ্ধভীতিও তেমনি সজাগ। তবু বলিতে হয়, সময় কই?

মা বলিতেন, ওরই ভেতর সময় করে নিতে হয়, এদিক ওদিক তো বেড়াস।

যাহাই হউক, পয়সা দিয়া কিনিবার উপায় যখন নাই, তখন মাছ ধরার উৎসাহ না আসিয়াই পারে না। আবার, একবার মাছ-ধরার নেশা পাইলে তাহা ছাড়ানোও দায়। পড়াশুনার ক্ষতি হয়। মাছ নহিলে ছেলেদের রোচেনা, এই ভাবিয়া মা'র নিষেধের ইচ্ছা শিথিল হইয়া আসে, কিন্তু পরক্ষণেই বুকটা দুরদুর করিয়া উঠে। বড় ছেলে ছিপটা হাতে লইলেই বলেন, তোরা একজন যা' বাপু।

বিশু বলে, এই তো এসে পড়লাম, মা।

'এসে পড়লাম' যে কী, মা তাহা জানেন। তাই প্রতিবাদ করিয়া বলেন, না—না—তুই থাক, যীশু তো গেছে রে। হ্যাঁরে তোর যে জলপানি পাবার কথা ছিল তার কি হল?

বিশু হাসিয়া বলে, আগে পরীক্ষা তো দি' মা।

মা বলেন, তা' বটে, কত টাকা লাগবে যে বলেছিলি?

ছেলে হিসাব দেয় আর হাসিয়া বলে, একথা তো বহুদিন বলেছি মা, তোমার মনেই থাকে না।

মা বলেন, মনে থাকে রে, সর্ব্বক্ষণ মনে থাকে। তাই তো বলি বাপু, তুই আর অত মাছ-টাছ ধরতে যাসনি বিশু, যীশু যা আনবে, তাতেই ঢের। যে করে হোক, তুই পাশটাতো কর, বলিয়া ছোট ছেলেটাকে বলিতেন, ও শিশু, বাছুরটাকে ধরবি আয় তো বাবা, মংগলিকে ছুঁয়ে নি ; না—না—এখন না—রোস্…হ্যাঁ, এখন ধর, ছাড়িস নি যেন…এই রে, না বাপু এই একটা মিনিট, বাঃ বেশতো, বেশতো, বাঃ বাঃ বেশতো বাবা…

চিড়িক্ চাড়াক্, চিড়িক্ চাড়াক্ দুধ পড়িতে থাকে।

তারপর এমন করিয়া, কবে কি করিয়া শিশু যে নিয়মিত গরু মাঠে চরাইতে ও তাহাদেরই রাতের খাদ্য হিসাবে ঘাস কাটিয়া আনিবার কাজে বহাল হইয়া গেল, সে প্রশ্নও কাহারও মনে জাগিল না। শিশু গরু চরায়, ঘাস কাটে, ইহাতেই তাহার আনন্দ এবং অত্যন্ত সহজভাবে তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ যাহা জুটিল তাহারা নামে নহে কর্ম্মহিসাবেও রাখাল। ভদ্রলোকের ঘরে এত বড় ভয়ানক দুর্নাম আর কিছু হইতে পারে না। শিশু তাই তাহাদের কাছে একটা সম্বোধন মাত্র নহে, একটা বিরাট ইঙ্গিত।

প্রতুল ইহার সকল অর্থ না জানিলেও এই অবনতির ইঙ্গিতটুকু উপলব্ধি করিত। করিত বলিয়া শিহরিয়া উঠিল। এই নামের সহিত জড়াইয়া যে অপমান জ্ঞানটুকু জাগাইবার জন্য ইহার উল্লেখ তাহার সম্পূর্ণ টুকুই প্রতুলের সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া যেন রি রি করিতে লাগিল। বই নাই, খাতা নাই, প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ মাঠ, সবুজ ঘাস গজাইয়া উঠিয়াছে ; ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত ছোট বড় নানা-বর্ণের গরু চরিয়া বেড়াইতেছে, কোনটা ছায়ায় জাবর কাটিতেছে, কোনটা পাশে যে নদীটা, তাহাতে নামিয়া জল পান করিতেছে, তাহাকে মাঠে ফিরাইয়া আনিতে—ও কে, শিশু—না প্রতুল ?

ভাবিতে তাহার গলার কাছটা কি-একরকম ব্যথা করিয়া উঠিল; অন্যান্য পাঠার্থীরা তাকাইয়া আছে; লজ্জায় সে না পারিল কিছু করিতে। তারপর এক সময় আবহাওয়াটা অসহ্য বোধ হওয়ায় এবং কল্পনাটা অতি-বাস্তব হইয়া ফুটিয়া ওঠায়, সে ধীরে ধীরে উঠিল; তেমনই ধীরে ধীরে উঠান পার হইয়া বাঁশের গেটের হুড়কা খুলিয়া বাহিরের চির-খর্ব্ব কামিনীগাছটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ছোট বাগান—বেড়ার গেটটা পার হইলে ঘরোয়া সঙ্কীর্ণ মাটি-ঘাসের রাস্তাটুকু পার হইলে সদর পাকা রাস্তা। হরিহরদের বাড়ীর অনেকেই সুপারির খোল লইয়া রেলগাড়ী খেলিতেছে; শিবু পিঁপিঁ করিয়া বাঁশী ফুঁকিতেছে, হরিহর ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিতেছে; বাদল আর নুটু চড়িয়া আছে। হরিহর প্রতুলের সমবয়সী; সে ডাক দিল, খেলবি নাকি পুতু?

প্রতুল বলিল, না। কিন্তু পরক্ষণেই গাড়ী ছাড়িয়া দেয় দেখিয়া 'খেলব' বলিয়া যোগ দিল।

হরিহর বলিল, তবে যে বললি, 'না', কেল্টু কোথাকার, নে আয়, টানবি আয়।

প্রতুল বলিল, আমি গার্ড হব।

শিবু চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, আমি গার্ড, ও বড়দা, গাড়ী ছাড়, বলিয়া বাঁশী ফুঁকিল, পিঁপিঁ; কারণ, সে জানে, গার্ডের বাঁশী বাজিলে আর থামিয়া থাকিবার উপায় নাই। হরিহর গাড়ী ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, আয় না।

প্রতুল এক পা হাঁটিয়া বলিল, খেলব না। প্রতুল হরিহরের সঙ্গী। তদুপরি খেলা জমিয়া উঠিতে গেলে লোক চাই। সে একটা আপোষ চাহে। শিবুর দিকে তাকাইয়া বলিল, প্রতুল একবার, তুই —একবার, আচ্ছা?

গার্ডের হুকুম অমান্য করায় শিবুর হয় তো রাগ ছিলই, তদুপরি যাহার জন্য এই বে-আইনী আবদার তাহাকেই অংশ দিতে হইবে

বলিয়া তাহার ক্রোধের সীমা রহিল না। বলিল, ও-ই খেলুক আমি খেলবো না।

হরিহর বলিল, কেনরে, এবারকার মত তুই-ই তো গার্ড, এর পরের বার হবে ও, তারপর—ফের তুই, নে বাঁশী বাজা, আয় পুতু।

হরিহরদের বাড়ীটা বেশ বড়। চারপাশেই একপ্রকার বলিতে গেলে রাস্তা। হরিহরের দাদামশাই কেবল এইখানে নহে, দারোগাগিরি করিয়া মফঃস্বলেও বিস্তর জমিজমা করিয়াছেন; এই জায়গাটুকু আদর করিয়া নাতনী মহামায়াকে দিয়াছেন; মহামায়ার সংসার বৃদ্ধির পক্ষে এই জমি সরস ও উর্ব্বর রূপেই দেখা দিল। হরিহর তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র।

চারিপাশটা ঘুরিয়া আসিতেই দেখা গেল, চৌমাথায় ব্যানার্জ্জি বাড়ীর মতি তাহার কাঠের গাড়ী লইয়া বাহির হইয়াছে। এতক্ষণ, সুপারির খোল যে গাড়ী নহে, খোল-ই মাত্র, এই ধারণা বা বিশ্বাস কাহারো ছিল না; কিন্তু যখন দেখা গেল, ঠিক গাড়ীর মতই চাকাওলা একটি বস্তু বাহির হইয়াছে, যদিচ বিশ্লেষণ করিলে ইহাও গাড়ী বলিয়া টেঁকেনা, তখন যে-খোলের গাড়ীর বাঁশী বাজাইয়া এবং ড্রাইভারি করিয়া ইহারা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করিতেছিল, তাহাই এই চলমান কাঠের বাক্সের কাছে একেবারে ম্লান ও তুচ্ছ হইয়া গেল। খানিকটা অপ্রতিভ হইয়াই যেন ইহারা থামিয়া গেল। কিন্তু ততক্ষণে পাড়ার আর সব পড়ুয়ারাই একে একে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই এই স্থবিরতা বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না। শীঘ্রই কাজ বাঁটা হইয়া গেল; একদল আরোহী থাকিল, পাতা ছিঁড়িয়া টিকিট হইল, হাত নামাইয়া সিগন্যাল ডাউন করিবার জীবন্ত পোষ্ট নিযুক্ত হইল, এমন কি, সুপারির খোলটাকেও কাঠের গাড়ীর সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইল। সে এক হৈ-চৈ ব্যাপার। অল্পক্ষণের মধ্যেই সকল ব্যাপার চুকিয়া গেল, গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

প্রতুল এইমাত্র ষ্টেশন মাষ্টার হইয়া থাকিয়া গিয়াছে, হরিহরও আরোহী হইবে বলিয়া অপেক্ষা করিতেছে, গজু সিগন্যাল……

হরিহর বলিল, এবার তোর গার্ড হবার পালা, না, পুতু?

প্রতুল বলিল, মতিটা কি রকম হিংসুটে দেখেছিস? কাঠের গাড়ীটা ওর ব'লে…

হরিহর বলিল, এই জানিস, পুতু, দাদামশাই এবার আমায় তিনচাকার সাইকেল কিনে দেবেন। কাঠের গাড়ীর চাইতে সে ঢের ভাল।

প্রতুল বলিল, মতিটাকে চড়তে দিসনা, আচ্ছা?

হরিহর বলিল, তুই আমাদের দলে আছিস গজু?

জীবন্ত সিগন্যাল পোষ্ট সরিয়া আসিয়া সাগ্রহে সম্মতি দিল; কোথায় কাঠের গাড়ী আর কোথায় ট্রাইসাইকেল!

প্রতুল বলিল, ভাই আজ দোকান-দোকান খেলবি?

হরিহর বলিল, আমাদের বাড়ীতে, য়্যাঁ?

গজু বলিল, মতি কিন্তু দোকান সাজায় বেশ।

প্রতুল বলিল, ছাই সাজায়। চ' আমরা টাকা কুড়িয়ে আনি, যাবি?

গজু বলিল, কিন্তু এবার যে আমার ড্রাইভার হ'বার পালা?

প্রতুল বলিল, হোক গে, আমি গার্ড হওয়া ছেড়ে দিচ্ছি…

হরিহর বলিল, আমি যে চড়তাম এবার।

ইহাও এক মন্দ খেলা নহে। গাড়ী লইয়া উহারা আসিয়া দেখিবে এখানে কেহই নাই। ভারী মজা হইবে।

হরিহর বলিল, আস্তে আস্তে পালাই চ।

প্রতুল বলিল, আস্তে আস্তে কেন, দেখলেই বা, আমরা আর খেলছিনে।

তাহার পর তিন বন্ধুতে মিলিয়া সেটেলমেণ্ট অফিস, ফৌজদারী, ট্রেজারি, জজ অফিসগুলির পাকা ড্রেন সব তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া

পুরানো, ব্যবহৃত নিক্ষিপ্ত ডাক টিকিট, কোর্ট-ষ্ট্যাম্প জোগাড় করিল। ইহাই দোকান-দোকান খেলিবার টাকা।

গজু বলিল, দেখেছিস কি-রকম একটা টিকিট পেলাম ?

সকলেই ছুটিয়া আসিল, গজুর এই আকস্মিক প্রাপ্তিতে অন্য দুজন তেমন আনন্দিত হইতে পারিল না। টিকিটখানা সবুজ রংয়ের, মাঝখানে কাহার একটি শ্বেতমূর্ত্তি; তাহার উপর আঁকিয়া বাঁকিয়া কয়েকটা লাইন চলিয়া গিয়াছে।

হরিহর বলিল, এটা কোথাকার রে।

প্রতুল বলিল, ও বাজে—বলিয়া অন্যত্র খুঁজিতে লাগিল।

গজু বলিল, বাজে বৈ কি, দাদাকে দেখাব।

হরিহর স্তূপীকৃত ময়লা ঘাঁটিয়া বলিয়া উঠিল, আমি একটা পেয়েছি রে।

আবার দুইজন ছুটিয়া আসিল। বহুক্ষণ পর্য্যবেক্ষণের পর তিনজন নিঃসন্দেহে আবিষ্কার করিল, ওটি একটি পাঁচশো টাকার ষ্ট্যাম্প। কাহারও বিস্ময়ের অবধি রহিল না। যে পাইল সে একটা ভীষণ কিছু পাইয়াছে বলিয়া যেমন উল্লসিত হইল, অন্য দুইজন আরেকজনের এই অসম্ভব প্রাপ্তিতে একটা জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। ইহার পর অন্বেষণ অনেক হইল, কিন্তু অত খুঁজিয়াও প্রতুল যখন মামুলী কয়েকটা টিকিট ও ষ্ট্যাম্প ছাড়া আর কিছুই পাইল না, তখন তাহার দুই চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। ক্লান্ত ও তিক্ত দেহ মন টানিয়া যখন সে দুপুর রৌদ্রে বাড়ী ফিরিল, তখন বিমলার প্রসব-বেদনায় সমগ্র বাড়ীটা উদ্ব্যস্ত।

দেবীকান্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মারা গেলেন; বিধবা ও দত্তকপুত্র শ্যামনগরে আসিয়া গেল। বিমলার প্রকৃতির খবর ইহারা পাইয়াছিল। তাই বিধবা বলিলেন, ঠাকুর পো, এলাম।

দেবীকান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তা বেশ তো, বাইরে কেন বৌদি···এই, কোথা গেলি সব···বলিয়া একটা অনাবশ্যক হৈ হল্লা করিয়া বসিবার ঘরের ভিতরের দিকে পরদা ঠেলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কেননা, দেবীকান্ত ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়াছিলেন; বুঝিয়াছিলেন কিন্তু নিজেকেও তেমনি নিরুপায় মনে করিয়াছিলেন, অথচ কাহারও কাছে তাহা প্রকাশ পায় ইহাও লজ্জাকর; এই জন্য ভাবিলেন, হৈ হল্লা করিয়া এমনই একটা অবস্থার সৃষ্টি করিবেন, যেখানে আপত্তির কোন কথা বলিবার অবসর না থাকে। কিন্তু গাড়ীতো আর নিঃশব্দে আসে নাই, তাই বিমলাও ঠিক এই পরদার কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। রুক্ষ কণ্ঠে বলিল, অমন চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

অপ্রতিভ ও চমকিত দেবীকান্ত বলিলেন, কৈ···না···

বিমলা দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল: জানতে যে এ চাপা যায় না, তবে খবরটা আগে পাইনি কেন?

দেবীকান্ত বলিলেন, সত্যি বলছি, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, দাদার মৃত্যুর খবরটাই জানতাম···

বিমলা বলিল, তাঁর অবস্থাটা জানতে না?

দেবীকান্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, কেন, বাড়ীতে এত জমি····

বিমলা বলিল, তাতে সরিক আছে, তদারকে খরচ আছে।

দেবীকান্ত বলিলেন, ওগো, তাদের অতবড় শোকের কথাটাও ভুলোনা, এ সময়···

বিমলা বলিল, ঐ ছেলেটাকেই যে ঘুরে ফিরে চাইছ, আর তার একটা হিল্লে···

পর্দ্দা ঠেলিয়া বিধবা প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, হ্যাঁ বউ তাই, নইলে বিধবার একটা পেট···

বিমলা বলিল, ছেলের দুটো পেট নয়; একটা চললে দুটোও চলত। কিন্তু এ কি রকম ব্যাভার গো, হচ্ছে স্বামী স্ত্রীতে কথা, অমনি হুরুৎ করে ঢুকে পড়া?

বিধবা বলিলেন, অন্যায় হ'য়েছে বউ। ছেলেটাকে তোমাদের হাতে সঁপে দিয়েই...

বিমলা বাধা দিয়া বলিল, আমাদের তো ছেলের অভাব নেই।

দেবীকান্ত বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, এসব বাড়াবাড়ি আমি সইব না, আসুন বৌদি...এই সৌরীন...ওরে, কে আছিস। দেবীকান্ত আবার পরিত্রাহি চীৎকার সুরু করিয়া ফাঁকে ফাঁকে এই হুকুম দিলেন যে, পূবের ঘরের মাঝের কোঠায় এই মায়ে-পুতে থাকবে, এখন একরকম আলগা উনোনে রান্না চলুক, আগামীকালের মধ্যেই তিনি ঐ কোনাটায় একটা হবিষ্যি ঘর তুলিবেন।

বিমলা বলিয়া উঠিল, কারণ, উত্তরাধিকার সূত্রে ওটা আমি শিগগিরই পাব...এই ছেলে, কাপড়ের আঁচলটা চিবুচ্ছিস কেন, বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নিজের অতি ক্ষুদ্র ছেলেটাকে মারিয়া মারিয়া লাল করিয়া তুলিল।

দত্তকপুত্র সৌরীন তেমনি ন্যাওটা, অসহ্যরকমের আদুরে। বয়স হইলে কি হয়? বিধবা যতই বড়াই করুন, ছেলেটার হিল্লে হইলে চলিয়া যাইবেন, ছেলে ছাড়িয়া তাঁহার নড়িবার জো ছিলনা। ইহার পূর্ব্বে দেবীকান্তের এক বিধবা বোন তাহার একটি পুত্রের "হিল্লে" কামনায় দেবীকান্তের কাছে পাঠাইয়াছিল; ছেলেটি গ্রামের সমস্ত গুণই পাইয়াছিল, মাড়োয়ারী গদিতে কাজ করিতে গিয়া মালামাল সহ একদিন চম্পট দিল দুই নম্বর বধূর প্রত্যাশায়। দেবীকান্তের লজ্জায় মাথাকাটা গেল, আপোষে ভগ্নীপুত্রকে স্থানীয় জেলের কবল হইতে রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু শীঘ্রই খবর পাইলেন, একই কারণে

এই ভবিতব্যকে ছেলেটি ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই ; ছয় মাসের জন্য বিশেষ একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিশেষ এক প্রকার পোষাক পরিয়া বিশেষ একপ্রকার সুনাম অর্জন করিতেছে। সৌরীনের রকম সকম অনেকটা ঐ ধাঁচের, কেবল একটি মারাত্মক দোষ বাদে। কিছু দিনের মধ্যে সকল পরিচয়ের মধ্যে এইটুকু জানা গেল, ছেলেটির চৌর্য্যপ্রবৃত্তি তো নাই-ই, উপরন্তু এই প্রবৃত্তির প্রতি একটা ঘৃণাই আছে। তদুপরি রক্তের টান; দেবীকান্ত ছেলেটাকে ভাল না বাসিয়া পারিলেন না। খোঁজ-খবর লইয়া ছেলেটির অল্পবিদ্যার জোরেই, লিটারেট কনেষ্টবলগিরিতে ঢুকাইয়া দিলেন। ভরসা পাইলেন ও দিলেন যে, কাজ করিলে শীঘ্রই দারোগাগিরি পাইবে। ভীষণ উৎসাহ লইয়া সৌরীন কাজে যাইতে লাগিল। তাহার পর, তিন মাস পর, একদিন তেমনই ভীষণ জ্বর লইয়া শুইয়া পড়িতে পড়িতে বলিল, কোন্ শালা এ চাকরী করে।

মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, কেনরে ?

সৌরীন বলিল, চুপ, লেপটা চেপে দাও···উঃ উঃ উঃ উঃ···

অসুখটা শক্তই হইল, সারিতে সময় লাগিল। অবশ্য ছুটির জন্য ভাবনা ছিল না, দেবীকান্ত তাহা করিয়া দিতে পারিতেন, সৌরীনের মা বলিলেন, থাক ঠাকুর পো, ও কাজে তেমন মঙ্গল দেখচিনে।

দেবীকান্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু বলিলেন, থাক, তাহলে দেখি আর কোথাও।

সৌরীন ইতিমধ্যে নানাপ্রকার দেবদেবতার ছবি আনিয়া ঘরে টাঙাইতে লাগিল। রাত থাকিতে পাড়াময় সকলকে জাগাইয়া হরিনাম করিতে করিতে নদীতে স্নান করিয়া আসিত ; ঘর বন্ধ করিয়া বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিত, তারপর হঠাৎ চীৎকার করিয়া গান ধরিত, পাতকী বলিয়ে কি গো, পায়ে ঠেলা ভাল হয়। গলা সুমিষ্ট না হইলেও উৎসাহ ও ভাঙা কণ্ঠের জোরে মানুষের না

শুনিয়া উপায় ছিল না; হরিলুট কোথাও হইতেছে শুনিলে সে বাড়ী পরিচিতই হউক, অপরিচিতই হউক, বসিয়া যাইত এবং যথাসম্ভব কণ্ঠ মিলাইয়া কীর্ত্তনে যোগ দিত; সময় সময় হয়তো দেখা যাইত, সে একাই গাহিতেছে; গাহিতে গাহিতে 'দশা'য় পড়িত। লোকের আর শ্রদ্ধার অবধি থাকিল না; চুল ছাঁটিয়া আগেই একটি চৈতন রাখিয়াছিল, এখন ফোঁটা তিলকও পরিতে লাগিল। ঘোষণা করিয়া দিল, মায়ের সহিত সে হবিষ্যান্ন খাইবে। এ-দেশ চৈতন্য মহাপ্রভুর দেশ, এই দেশের লোকেরা এই চেতনাকে চিরকাল ভয় ও ভক্তি করিয়া আসিয়াছে, কাজেই কি জানি গৌরাঙ্গই হয়তো হইবে মনে করিয়া কেহই ইহাতে বাধা দিতে পারিল না। মা ভিতরে ভিতরে বংশরক্ষার দুশ্চিন্তায় আদরের মাত্রাটা বাড়াইয়া দিলেন; দেবীকান্ত. দেবীকান্তের সংসার এই নবচেতনা-প্রাপ্ত সাধুটির নিত্য-নতুন উপচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ও উঠিল। বাহির হইতে রগড় দেখিবার নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়াও পাড়াপড়শীর চমক লাগিল। বিশেষ তাহার গল্পের তোড়ে ইহাদের যেমন আনন্দ হইত, তেমনি ইহার বাড়াইবার ভঙ্গীটুকুও ইহাদের একটু তিক্ত না করিয়া পারিত না।

১৯১৪ সালের ঝড়ের কথা? শুনুন তবে, আরে বাপ, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। পাঁচ ছয় জন আড়মোড়া ভেঙে শুতে পারে এমনি বড় খাট। মা আর আমি। খাটটা একবার পূবে একবার পশ্চিমে, একবার পূবে একবার পশ্চিমে, একবার এদিক একবার ওদিক, একবার এদিক....ঘরটিও যেমন তেমন মনে করবেন না, ঠাকুর কাকার বড় ঘরটার চাইতে বড়ো। এমনি অবস্থায় হাওয়ার জোরে উত্তরের বেড়াটা গেল ছুটে, সে কি আওয়াজ, পট্‌পট্ ঝাম্ সে…ছুটেপিটে এলাম, ঘরে বেত কাটা ছিল, ছিল তো ছিল, সবে বাঁধছি, এমনি সময় দক্ষিণের বেড়াটা, ওমা দেখি কি, পাখীর মত উড়তে লাগল; ঐ অতবড় গাছ, ওর চাইতে খাটো তো হবেই না,

দিব্যি পার হয়ে গেল, চট্‌পট্‌ হাতের বেড়াটা বেঁধে নিয়ে ছুটলাম, মা বললেন, কোথা যাস, সর্ব্বনাশ। আর সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ হোল আমার, সোনাকাকার ঘরের একটা টিন সাঁ করে কানের কাছ দিয়ে উড়ে গেল, সেই ভীষণ ঝড়ে দেখি কী, ঘরের চাল, গামলা, ঢেঁকি ধুলোবালি গাছ-পালা সব উড়ছে, পালিয়ে এলাম, একটা আলোর ঝল্‌কানি হলো প্রায় দুমিনিট, দেখি এক-বৌট্টা মুড়ি ছিকার ওপরেই উপুড় হয়ে পড়ে আছে, মুড়ি ঘরময়, কিন্তু বৌট্টা....

প্রতুল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, বৌট্টাটা কি ছোড়দা?

সৌরীন ক্ষেপিয়া উঠিল, বৌট্টাটা কি, বৌট্টাটা কি, বৌট্টা জানিস না লেখাপড়া করিস কেন, যাঃ আর বলবই না, বলিয়া রাগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। সকলেই একচোট প্রতুলের উপর লইল।

প্রতুল আত্মসমর্থনে বলিল, বারে! আমি কী করলাম?

একজন বলিল, তোর ফোঁপর-দালালীর দরকার কি বাপু!

প্রতুল চুপ করিয়া গেল।

কিন্তু সৌরীনকে আবার পাওয়া যাইত। ধরিয়া পড়িলে ঐ একগল্প সে সহস্রবার বলিতে পারে।

সৌরীনদের পাশের উত্তর ঘরটাই প্রতুলদের পড়ার ঘর। সেদিন সকালবেলা প্রতুল আর সেজদা পড়িতেছিল, দক্ষিণের কোঠায় সৌরীন ধ্যানস্থ; হঠাৎ সেই ঘর হইতে একটা হাসির আওয়াজ আসিল। প্রতুল ঝোঁকের মাথায় জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, কি সোনাদা?

কোন জবাব আসিল না। জবাব আসিল না বটে কিন্তু পাঁচ মিনিট পর একটা হুঙ্কার প্রতুল ওদের সচকিত করিয়া তুলিল: তোদের জ্বালায় ধম্মকম্মও কি করতে পারব না?

উভয়েই ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল।

সৌরীন বলিল, আমার গোপাল সবে এসে আমার থেকে

খাবার খাচ্ছে, আর অমনি তোদের ডাকের সময় হোল, নাঃ, বনে জঙ্গলেই যেতে হোল।

বিমলা উঠান পার হইতেছিল, বলিল তাই যাও, ধম্মকম্ম করবে তুমি, উদরান্নের জোগাড় করবে আর একজন, ও হয় না। কি হয়েছে রে পুতু, তোকে যে অত করে শাসাচ্ছে ?

প্রতুল বলিল, আমি কিছুই করিনি, মা, সোনাদা একাই হাসছিলেন, আমি তাই জিগগেস করছিলাম।

বিমলা বলিল, বেশ করেছিলি। নে ঢের লেখা-পড়া হয়েছে, এবার ছেলেটাকে একটু খেলা দে তো, দেখিস আবার ফেলিস নে যেন।

প্রতুল এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইয়া বিমলার কাছে খানিকটা কৃতজ্ঞ না হইয়াই পারিল না। বলিল, আয় ঝুণ্টু, কিন্তু পরক্ষণেই বলিল, কিন্তু কাঁদে যদি ?

বিমলা যাইতেছিল, বলিল, কী হবে ? উম, উনি যেন আর কাঁদেন নি,......

বাহির হইতে হঠাৎ কলকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, এই, সাপুড়ে. সাপুড়ে—পুতু—বিন্নু......

প্রতুল বলিল, মা, আমি সাপ দেখতে যাব।

বিমলা ঝামটা দিয়া উঠিল, কোথায় হচ্ছে, কেবল চ্যাঁচালেই হোল, বোস।

প্রতুলকে অগত্যা বসিতেই হইল, কিন্তু বাহির হইতে তেমনই তাগাদা আসিতে লাগিল। বিমলা চলিয়া যাইতেই সেজদা টুক্ করিয়া সরিয়া পড়িল। প্রতুল প্রতিবাদ করিয়া বলিল, বারে, আমি যাব না বুঝি।

সেজদা ইহার জবাব দিল না। যত রাগ তাহার এই শিশুটার উপর হইল। তাহার দিকে ঠোঁট উল্টাইয়া ভ্যাংচাইল। পরে বাহিরের গোলমালে আকৃষ্ট হইয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইল। যাহা

দেখিল, তাহাতে ঝোঁকের মাথায় লাফ দিয়া চৌকি হইতে নামিয়া পড়িল, কি মনে করিয়া ঝুন্টুকে আনিতেই....

বেশী চোট লাগে নাই

কিন্তু——

হতভাগা ছেলে, তখোনি একশোবার করে বললাম, বিমলা ছুটিয়া আসিল। ত্রস্তে এক হাতে ঝুন্টুকে লইয়া ও মাইয়ে উহার মুখ গুঁজিয়া অন্য হাতে প্রতুলের গালে মাথায় চড় চাপড় মারিয়া উপসংহাররূপে একটা ঠোনা মারিতেই প্রতুল দরজার কাছে ছিটকাইয়া পড়িল।

বিমলা বলিল. বেশ হয়েছে, আক্কেল হয়েছে...

প্রতুল কাঁদিল না, ধীরে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

পানুদের বাড়ীর বাইরেটায় যেখানে ডাঁটাক্ষেত ছিল, সেখানে তখন লোক জমিয়া গিয়াছে। সাপুড়ে বাঁশী বাজাইয়া সাপ খুলিতেছে। এককালে সাপের খেলা হইয়া গেল; সাপুড়ে ঔষধ লইয়া কেরামতি করিল, তারপর তুবড়ির কথা উঠিল। সাপুড়ে বলিল, মঁয় জানতা হুঁ, লেকিন ঐসা.......

অনেকে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, আরে ওতেই হবে, এখন রজনীবাবু রাজী হলেই হয়।

রজনীবাবু আসিলেন; বৃদ্ধ, শীর্ণকায়। প্রতুলদের বাংলা স্কুলের মাষ্টার। ছেলেদের ভয়ানক মারেন; একটিতে হয় না, পাঁচটি বেত চাই, একটা ঝাঁটা বিশেষ, পড়ার চাইতে মারের খবরদারী ঢের বেশী। কৃপণ বলিয়া একটা দুর্নাম আছে, সেটা নেহাৎই বাজে কথা; দাদা অনুগ্রহ করিয়া কিছু টাকা দিয়াছেন, ব্যাঙ্কে জমা আছে, সেদিকেই লোকের দৃষ্টি; মেয়ে আছে। আসলে মাইনে সর্ব্বসাকুল্যে কুড়িটি টাকা মাত্র। প্রতুলও শুনিয়া শিখিয়াছে, সে কঞ্জুষ, কিন্তু জানেনা কেন এবং কি প্রকারে। রজনীবাবু এই মিথ্যা দুর্নামের তেমন প্রতিবাদ করেন না বটে, ছেলে-পুলেদের সহিত

অযথা মস্‌করা করিয়া নিজেকে খেলো করিয়াছেন। কিন্তু লোকে এই এক জায়গায় তাঁহাকে ভয় পাইত। এই তুবড়ির মন্ত্রগুলি! প্রতুলের ভয়ের সীমা নাই। অঙ্কের ভূমিধর মাষ্টার মারেন, নিবারণ হেডপণ্ডিতও মারেন; নামটা ইঁহার নীচের ছাত্রমহলে বেশ ভালভাবেই জানিত। কিন্তু তদপেক্ষা আরও তীব্র ও কঠিন ইহাঁর মন্ত্রগুলি!

রজনীবাবু মাটি হইতে খানিকটা ধূলা ও সরিষা তুলিয়া লইলেন। সাপুড়িয়া বাঁশী বাজাইয়া বাজাইয়া ঘুরিতে লাগিল; হঠাৎ রজনীবাবু হাতের ধূলাসরিষা খানিকটা সাপুড়িয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলেন, সাপুড়িয়া টাল সামলাইতে সামলাইতে ঘুরিয়া পড়িল ও শরীরের এক একটা অংশ ধরিয়া আউ আউ ধ্বনি করিতে লাগিল। যাহারা জানেন, তাঁহারা বলিলেন, উহাকে বোলতায় ভীষণ কামড়াইতেছে। বোলতা কই? দেখা যায় না। যাহা হউক সে মাটিতে দাগ কাটিয়া উঠিয়া পড়িল এবং রজনীবাবুকে একটি 'বান' মারিল। তিনি নাকি ওস্তাদ, তাই তিনি উহা পূর্ব্বেই কাটিয়া (একটু বাঁকা অবস্থায়) দিলেন। এই প্রকারে রেষারেষি চলিতে লাগিল। একবার বাঁশী সাপুড়িয়ার গলায় ঢুকিয়া গেল, তামাক খাইতে কল্কির অনেকটা ঢুকিয়া গেল, কাশিতে কাশিতে রক্ত পড়িল, রসগোল্লা খাইতে ঐ একই প্রকার হাল হইল এবং শেষাশেষি সকলকার দুশ্চিন্তা ও পরিতৃপ্তির মধ্যে খেলা সাঙ্গ হইল। সাপুড়িয়া বকশিস লইয়া বিদায় হইল। সমবেত লোকজন রজনীবাবুকে ঘিরিয়া নানাপ্রকার বিস্ময় ও সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার পর রজনীবাবু সর্ব্বশেষে বলিলেন যে, তিনি এমন করিতে পারেন, মন্ত্রপূত একটি কচু চিড়িয়া দুই খণ্ড করিতে থাকিবেন, আর, লোকটির ঠ্যাং ক্রমাগত ফাঁক হইতে হইতে চিড়িয়া যাইবে মাথা পর্য্যন্ত। প্রতুলের সমস্ত শরীর দুই পা বহিয়া মাথা পর্য্যন্ত শির শির করিতে লাগিল; মনে হইল কাণ্ডটা তাহার উপর দিয়াই সুরু হইয়া গিয়াছে।

সে যথাসম্ভব পা দুইটা চাপিয়া দাঁড়াইয়া ঐ খর্ব্ব ও শীর্ণকায় বৃদ্ধের ক্ষমতার পরিমাপ করিতে লাগিল। কিন্তু রজনীবাবু বলিতে লাগিলেন, সব্বার ওপর এর ব্যবহারে গুরুর নিষেধ আছে, প্রায় করিতেই নাই। প্রতুল এই কথায় খানিকটা আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু একেবারে নিঃসংশয় হইতে পারিল না; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, ইহার সহিত আর যাহাই হউক শত্রুতা করা চলিবে না। স্কুলে যাইবার পূর্ব্বে চুপিচুপি সৌরীনের অনুপস্থিতিতেসৌরীনের সাজানো ছবি কয়খানিকে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম জানাইল। বাড়ীর বাহির হইতেই দেখিল বাছুরে দুধ খাইতেছে, পানুকে ডাকিয়া বলিল, এই আজ ভারী ভালরে, বাছুরে দুধ খাচ্ছে, এ দেখলে ভালো হয় জানিস?

পানু বলিল, জানি।

বাংলা স্কুলে যাইতে পাণ্ডাবাড়ী পড়ে। সেইখানে গিয়াও বারান্দায় একপ্রস্থ প্রণাম ঝাড়িয়া স্কুলে আসিয়া বসিল।

পানুকে বলিল, এবারকার প্রমোশনটা হয়ে গেলেই আমরা ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হব। আমি নাইন্থ ক্লাশে, সেজদা এইট্থ, মেজদা বলেছেন। তুই?

পানু বলিল, আমিও হব। অমনি পৈতেটাও আমার হয়ে যাবে বাবা বলছিলেন।

প্রতুল বলিল, পৈতে?

পানু বলিল, হ্যাঁরে, আমরা যে ব্রাহ্মণ। তখোন কিন্তু ক'দিন তোদের মুখ দেখব না, জানিস?

প্রতুল বলিল, কেন কেন?

পানু বলিল, তোরা যে শূদ্র।

প্রতুল কথাটা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল।

পানু বলিল, দেখিস না, তাই ঠাকুমা আমাদের রান্নাঘরের বারান্দায় তোদের উঠতে দেন না, তুই হরদম আমাদের বড় ঘরে

যাস বলে এটা ওটা ছুঁবি ভয়ে ঠাকমার সে কি বকুনি আমাদের ওপর।

প্রতুলের সবই মনে পড়িতে লাগিল।

পান্নু বলিতে লাগিল, ঠাকুমা বলেন, তোরা শূদ্র বলে তোদের ছোঁয়া কিছু আমাদের খেতে নেই, তোদের সঙ্গে বিয়ে টীয়ে কিছুই হোতে পারে না।

প্রতুল বলিল, কিন্তু আমি তো শুনেছি আমরা কায়স্থ।

পান্নু বলিল, আরে কায়স্থ ফায়স্থ সবই শূদ্র, ঠাকুমা বলেন···

প্রতুল বলিল, ভগবান করেছেন?

পান্নু বলিল নিশ্চয়ই। সেদিন আবার গিয়ে উঁকি মারিস নে যেন।

প্রতুল ধীরে ধীরে বলিল,—না।

ইহারা একই স্কুলে পড়ে, একই ক্লাশে। ভিন্ন বাড়ীতে থাকে বটে কিন্তু তাই বলিয়া এতখানি তফাৎ হইল কি করিয়া? শুভযাত্রা! প্রতুল ভাবে।

হেমির গত বছর বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

প্রভার বিবাহ এই বছর নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল—তৃতীয় রুক্মিণী ওরফে স্নুকু থাকিল; তা' তাহার এখন দুই একটা বছর সবুর সহিবে। সর্ব্বকনিষ্ঠা বলিয়া আদরেও বটে, একটু লেখাপড়া শিখাইবার সঙ্কল্পও দেবীকান্তের ছিল। তদুপরি, উহার ছেলেমানুষি স্বভাবের জন্য দেবীকান্ত গরজ আরও কম দেখাইতেছেন। সেদিন

টিকাদার সাহেবকে টিকা দিতে সামান্য ব্যথা দিবার জন্য সজোরে এক পদাঘাত। অভিভাবক-মহলে লজ্জার অবধি নাই, সে কিন্তু নির্ব্বিকার। ছোট ভাইদের কাছে পাইলে কোন একটা অছিলায় তাদের পিঠে দুই একটা ধুপ ধাপ শব্দ করে। ছেলেপুলে কখনো কোলে নেয় না। দেবীকান্তের কিন্তু সবই ভাল লাগে।

বিমলার ঝুন্টুর পর মন্টু হইয়াছে।

এবং আর একটি সম্ভাবনার কোঠায়।

প্রতুলের নাইন্‌থ ক্লাশে প্রায় একটা বছর ঘুরিয়া আসিল। পড়াশুনায় যাহাই হউক, দুইটি অবাঞ্ছনীয় স্বভাব থাকিয়াই গেল, বয়সের সহিত ইহার সম্পর্ক থাকিল না।

প্রতুলের মশারী তুলিয়াই সেজদা চ্যাঁচাইয়া বলিল, মুতেছে, মুতেছে।

রুক্মিণী নাকে কাপড় দিয়া উঁপ উঁপ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

বিমলা বলিল, দে ওকে খাইয়ে দে, মুখে গুঁজে দে।

সেজদা বলিল, গন্ধ।

বিমলা বলিল, হবে না? বুড়োধাড়ীর মুৎ। ওকে তোল, তুলে মাথায় প্রদীপ বসিয়ে সব বাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে আয় দেখি।

দেবীকান্ত বলিলেন, আঃ, কি কর?

বিমলা রুখিয়া বলিল, কেন?

দেবীকান্ত বলিলেন, ফি রাত ও এই কাণ্ড করছে, রাতে একবার ডেকে তুলে অভ্যেস ফেরানোর বেলা কেউ নেই…

বিমলা বলিল, যার যা' অভ্যাস …

দেবীকান্ত যেন শোনেন নাই এই ভাবে বলিতে লাগিলেন, রোগ মনে ক'রে এক বোতল ওষুধ এনে দিলাম, সামান্য একটু গরম জলের অভাবে ছেলেটার একটা দাগ ওষুধও খাওয়া হ'ল না।

বিমলা 'বেশ' বলিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া চলিয়া গেল।

দেবীকান্ত বলিতেই লাগিলেন, অথচ সব্বাই মিলে দিলে ওকে আলাদা করে। তোমাদের সব্বার ঘেন্না। ছেঁড়া তোষক কাঁথায় ছেলেটা শুয়ে থাকে কিছু বলিনে, কিন্তু আলাদা করে দেয়ায় রোগ যে বেড়েই চলল। জাগিয়ে যে একটু···

বিমলা অকস্মাৎ রান্নাঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া বলিল, তুমি থামবে না?

দেবীকান্ত বলিলেন, সত্যি বলতে গেলে তাই-ই হয়। যাক, আমি আর কদিন আছি।

বিমলা বলিল, কেন তুমি সত্যবান, সাবিত্রী তোমায় ফিরিয়ে আনবে।

ইহার পর দেবীকান্ত একেবারেই স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

প্রতুল ইতিমধ্যে কাপড় ছাড়িয়া পড়িতে বসিয়া গিয়ছে। কিছুক্ষণ পড়িবার পর, মাকে উঠান পার হইতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, মা, খেতে।

বিমলা যাইতে যাইতেই উত্তর দিল, হবে হবে, পড়তো।

প্রতুল তবুও বলিল, খিদে পেয়েছে, ও মা।

সে-কথার জবাব আসিল না।

খাওয়ার প্রার্থনায় সেজদার সহানুভূতি ছিল, কিন্তু জবাব না পাওয়ায় প্রতুলকে বলিল, কী রে খালি খালি ম্যা ম্যা করছে।

প্রতুল বলিল, তো, তোর তাতে কী?

মুতুনিটা···

প্রতুল একটু লজ্জা পাইলেও বলিল, বেশ।

সেজদা বলিল, দাঁড়া আজ স্কুলে বলে দোব। ইহার চাইতে অপমানকর কিছু হইতে পারে না; এইটুকু প্রচারের পর সমপাঠীদের নিকট হইতে যে হল্লা উঠিবে তাহার ঠেলা সামলানো যে কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে, ইহা সে বুঝিত। অথচ ব্যাপারটা মিথ্যাও নহে। প্রতুল উঠিয়া আসিয়া সেজদাকে ধাই ধাই করিয়া মারিল।

সেজদাই ছাড়িবে কেন? ফলে তুমুল কাণ্ড। সশব্দ লড়াই, বই পুস্তক কে কোথায় গড়াইয়া পড়িল; গলা টেপাটেপি পর্য্যন্ত। বাড়ীর দুই একজন অনেকটা দর্শকের মত কিংকর্তব্যের দোলা খাইতেছিল, মেজদা কোথা হইতে আসিয়া দুইজনকে দুই দিকে ছাড়াইয়া বলিলেন, কী এগুলো, রোজই কি মারামারি করবে?

পাড়ার দিদিমা আসিয়াছিলেন, বলিলেন, পিঠে পিঠে কিনা, ওগুলো ঐ রকমই হয়।

মেজদা বলিলেন, কিন্তু এ কদিন চলবে? বয়সও তো কম হোল না।

দিদিমা নিজের অভিমত জানাইলেন, যাবে—যাবে। এখনই এমন কি বয়স হয়েছে। আমার বন্ধু আর ললিতা—পিঠোপিঠি—ওঃ কি ঝগড়াই করত, এখন মনে করে হাসে। তেমনি ইটোয়ারীতে দেখে এলাম বন্ধুর ছেলে দুটো, এই বয়সে তো আর কম দেখলাম না।

মেজদা বলিলেন, এই, তুই এমুখো হয়ে পড়, আর তুই ও-মুখো হয়ে পড়।

তাহাই হইল।

আরও কিছুক্ষণ পর কয়েকটা নাড়ুসহ এক-এক বাটি মুড়ি ইহাদের সমুখে বিমলা রাখিয়া গেল। পাত্রগুলির শব্দ হইল ঠক্ ঠক্, মুখে বলিল, নাও গেলো।

প্রতুল স্পর্শও করিল না, বই-ও পড়িল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেজদা আস্তে আস্তে পিছন ফিরিয়া দেখিল, প্রতুল ঐ মুখ করিয়া বসিয়া আছে, খাইতেছে না; সেজদা অভ্যাসবশতঃ দুই এক মুঠ খাইয়া বলিল, পুতু, নাড়ু নিবি?

প্রতুল মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, লাগবে না, যাঃ। বলিয়া আবার মুখ ভার করিল।

সেজদা বলিল, মুড়িও দোব চাট্টি।

প্রতুল বলিল, লাগবে না বলছি।

সেজদা ইহার প্রত্যুত্তরে আরও মিনিটখানেক চুপ করিয়া বলিল, আচ্ছা যা, সে-কথা স্কুলে বলব না।

প্রতুল বলিল, না, বলবে না আবার, তবে গজুদের বলছিলি কেন ?

সেজদা বলিল, ক্লাশে তো বলিনি।

প্রতুল বলিল, বড় বাকী রইল, পান্নু যদি বলে ?

সেজদা বলিল, তুই বুঝি আর ওর কথা বলতে পারবিনে ?

প্রতুল তবুও ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, হ্যাঁ।

সেজদা বলিল, নে বাটীটা এগো

প্রতুল বলিল, ঐ চাট্টি ?

সেজদা বলিল, আচ্ছা নে আর দু'মুঠ।

প্রতুল বলিল, নাড়ু ?

সেজদা বলিল, এই যে দিলাম দু'টো।

চাই না তোর মুড়ি, বলিয়া ফেরৎ দিতে উদ্যত হইতেই সেজদা বলিল, আচ্ছা আচ্ছা এই নে আর একটা, আমার মোটে তিনটে থাকল, তোর হ'ল ন'টা

প্রতুল কিছু না বলিয়া খাইতে লাগিল।

তাহার পর একসময় তাহারা নদীতে স্নানের জন্য আসিল। প্রতুলের সমবয়সীরা সকলেই অল্প বিস্তর সাঁতার জানে। তাহারা যে যার সাধ্যমত এদিকে ওদিকে সাঁতার খেলিতে লাগিল। একদল একটু বয়স্ক নদীর উঁচু পাড় হইতে লাফাইয়া জলে পড়িতে লাগিল। ঝপ করিয়া শব্দ হয়, টুপ করিয়া ডুবিয়া যায়। একা প্রতুল এক বিঘৎ কাদার জলে দাঁড়াইয়া উহাদের দেখিতেছে এবং মাঝে হাপুর হুপুর করিয়া গা ভিজাইতেছে যেখানে বিধবারা জলে দাঁড়াইয়া আহ্নিকাদি করিতেছেন। সন্ধ্যারতা কোনো বিধবা বলিতেছেন, এই, জল ছিঁটবে, অথবা কথা না বলিয়া ভুরু কুঁচকাইতেছেন। একবার সেজদা আসিয়া প্রতুলের পা ধরিয়া এক হেঁচকা টান। মানুষের

মরণ-ভীতি কি প্রকার, তাহা প্রতুলের চেহারায় সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে। আর সে কী আর্ত্তনাদ !

বাবাগো—মাগো, বড়দা !

বড়দা দূর হইতে সেজদাকে বলিলেন, এই— ছেড়ে দে।

প্রতুল হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইতিমধ্যে বিধবাদের মধ্যে একপ্রকার ভীষণ গল্প চলিতেছে। একজন বলিলেন, হ্যাঁ, আমিও ওরকম শুনেছি, মনসার-মা। ছেলেরা নদীতে এমনি খেলছিল। নীচে ছিল মস্ত বড় এক গোঁজ।

একজন শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন, ইঃ।

যিনি বলিতেছিলেন তিনি বলিতে লাগিলেন, রোজ খেলছে, ছেলেরা তো জানে না, পড়বি তো পড়—একদম এফোঁড়, ওফোঁড়…

আবার একটা অস্ফুট ধ্বনি হইল।

প্রতুলের সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল।

ইহারই সূত্র লইয়া একজন বলিলেন, তাই তো আমি এদের এত করে নিষেধ করি, ওরকম লাফাস না, লাফাস না, লাফাস না, কে কার কথা শোনে ? আমাদের বাড়ীরটা ? ওর কথা আর বোলো না, ওটা একটা দস্যি। ছেলে জন্মানো নয়, আপদ জন্মানো। কী দুশ্চিন্তাতেই যে আছি রাণুর মা, বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন : এই, নতুন—নতুন, ছাখ কথা কানে যায় কিনা ? তবুও জবাব না পাইয়া বলিয়া উঠিলেন ? স্কুল বলে রক্ষে, নইলে একি সারাদিনে আজ থামত ?

বড়দা বলিলেন, আয় পুতু, ডুবিয়ে আনি।

প্রতুল পড়ি-কি-মরি করিয়া ডাঙার দিকে ছুটিল। কিন্তু বড়দা ইহা আগেই জানিতেন। তাই নাগালোর মধ্যে আসিয়াই ডাক দিয়াছেন। প্রতুল এতক্ষণ অপলক নেত্রে বিধবাদের এই ভীষণ গল্প শুনিতেছিল এবং সে যে দস্যিছেলে নয়, আর সেই কারণেই গোঁজের হাতে মৃত্যু হইতে বাঁচিয়া যায়, সেই কথা ভাবিয়া নিজেকে সহস্রবার

ধন্যবাদ দিতেছিল। এমন সময় বড়দা হাঁক দিলেন। আর সময় কোথা? চীৎকার! বড়দা হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। চমকিত ভীত প্রতুলের সে যে কী এক অবস্থা! তারপর ওয়ান-টু-থ্রি করিয়া এক ডুব, আর এক ডুব; প্রতুল উৎকণ্ঠায় নিশ্বাসে মুখে এক প্রকার শব্দ করিতেছিল, অন্য ছেলেরা তাহা দেখিয়া হাসি সামলাইতে পারিতেছিল না। সেই মুহূর্ত্তে প্রতুলের মনে হইল বড়দা তাহার ভীষণ শত্রু, তাহাকে ডুবাইয়া মারিতেছেন—আবার এক ডুব!

যাঃ হয়ে গেল, বলিয়া প্রতুলকে ডাঙায় রাখিতে রাখিতে বলিলেন, ছেলের কী ভয়!

প্রতুল মুখ ফুলাইয়া বলিল, কুমীর!

বড়দা হাসিয়া বলিলেন, কোথায় কুমীর? ক্ষ্যাপা আর কি! বলিয়া নিজে আবার ডুব দিতে গেলেন।

রাণুর মা বলিলেন, কুমীর এ-নদীতে নেই বললেই হয়, মনসার মা, হাঁ, কুমীর বটে আমাদের দেশে, প্রায় মাসে একটি না একটি লোক নিচ্ছেই, এই সুমুখ থেকে, ডাঙায় এসে পর্য্যন্ত। এক বাড়ীর বউ, নতুন বউ, সমস্ত গা গয়না, এমনি অবস্থায় এসেছিল বাসন ধুতে, ওমা অমনি টপ করে খেয়ে নিলে গা।

মনসার মা বলিলেন, শুনেছি, কুমীরের বাসায় গয়না গাটির পাহাড় জমে থাকে।

রাণুর মা বলিলেন, শোনা কথা কি বলছেন, ওযে প্রত্যক্ষ।

মনসার মা বলিল, এ নদীতে ঘড়িয়াল আছে।

একজন বলিলেন, হ্যাঁ, ওরা মানুষ খায় না, কিন্তু কুমীর?

প্রতুল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, একটা আস্ত মানুষ গিলে খেতে পারে কুমীর?

অতসী রাণুর মেয়ে, মানে, রাণুর মা'র নাতনী, হাসিয়া বলিল, পুতুটার জলে নাবতে য্যাতো ভয়!

মনসার মা বলিলেন, ও অনেকের হয়ে থাকে।

রাণুর মা বলিলেন, কিন্তু কপালের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারে না, মনসার মা। সেই গল্পটা, গল্প তো নয় সত্যি ঘটনা—এক ছেলের কপালে বিধাতাপুরুষ লিখলেন, জলে ডুবে মরবে। সওদাগরের ছেলে, অতি যত্নে জল নেই এমন উঁচু জায়গায় ঘর করে রাখা হল। ঘরে একটা প্রদীপ—ঐ যে দোতলা মাটীর প্রদীপ, নীচেটায় জল থাকে, ওপরটায় তেল আর সলতে—একটা সেই প্রদীপ। ওমা, সেই জলেই কিনা ছ'টো—ছটো মাত্র চুল ডুবিয়ে ছেলেটা মরে আছে!

একজন বলিল, যাই বল, জলে ডুবে মরা ভারী কষ্ট।

বড়দা বলিলেন, চ, পুতু, কাপড় ছাড়িসনি এখনো? চ, চ।

প্রতুল তন্দ্রাহতের মত বড়দার অনুসরণ করিল।

আজ খাইতে বসিয়া কিছুই ভাল লাগিল না, সব কিছুই বিস্বাদ ঠেকিল, হঠাৎ বলিল, খাব না।

বড়দা বলিলেন, কিছু না, নিত্যকার দেনা শোধ। গাধা জল না ঘুলিয়ে খেতে পারে না তো। তবুও বলিলেন, খা, খা।

বিমলা বলিল, পেটে টান পড়লে নিজেই খাবে'খন।

প্রতুল বলিল, ভাঙা মাছ।

বিমলা বলিল, মাছ কি আস্ত গিলে খায় যে, ভাঙা আর আস্ত?

প্রতুল বলিল, আলু কই?

বিমলা বলিল, আলুর তরকারীতে হল না, আবার মাছে আলু চাই?

সৌরীনের মা বিমলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, ওকে একটু নিরামিষ দিই, বৌ?

অনুমতি চাওয়ায় বিমলা খুসী হইল। বলিল, না, অত আস্কারা দেয়া ভাল না। পরে বলিল, দিতে চান, দিন একটু।

খাওয়া হইল।

রেকাবের উপর সুপারি কাটা ছিল, তাই এক টুকরা লইয়া বইখাতা হাতে বাড়ীর বাহির হইতেই কাসেমের সহিত দেখা। বলিল, এই তোদের নারকেলি সুপুরি নইলে ভাল লাগে না, আমাদেরগুলো কাঠ কাঠ।

এই অবিসম্বাদিত সত্যে কেহ আপত্তি করিল না। সকলেই এই সুপারি খাইতে ভালবাসে বলিয়া কাসেম পকেটভর্ত্তি সুপারি লইয়া আসে; নিজেও খুব খায়। ওদের জমির সুপারি, কিনিতে হয় না। পড়াশুনায় এবং স্বভাব চরিত্রে, সর্ব্বোপরি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় ইহাদের সাধারণ পর্য্যায়ে ফেলানো দুঃসাধ্য তো ছিলই, পাড়ার সকলে অত্যন্ত খুসী হইয়া ইহাদের সহিত মিশিত; ইহারাও অবাধে মিশিত। হিন্দু পল্লীর এই একটি মাত্র মুসলমান পরিবারের (পরিবার বলিতে মেয়েরা কেহই থাকিত না) পার্থক্য লইয়া কোনো প্রশ্নই কোনদিন জাগে নাই। বরং কাসেমের জ্যাঠামশাইয়ের অক্লান্ত ও সদা সচেষ্ট আগ্রহে সাধারণের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক সততার আবহাওয়া পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে বলিয়া লোকে ইঁহার জন্য একটি সম্মানের আসন রাখিয়াই দিত; ধনী বা অহিন্দু বলিয়া কোন তর্কই উঠিত না। হিন্দু উৎসবের প্রতি কোনোদিন কোনোছলেই ব্যঙ্গ তো করেনই নাই, ইঁহার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন সাম্প্রদায়িকতা খুঁজিয়া বাহির করাও সম্ভব ছিল না। পড়ুক বা না পড়ুক, সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি অতি-হিন্দুদের যে একটি অন্ধমোহ আছে তাহা লইয়াও বাদানুবাদ তিনি করেন নাই। অথচ মুসলমানের হাবভাব আচার-অনুষ্ঠানের বিন্দুমাত্র ত্রুটিও কেহ খুঁজিয়া পাইত না। দাড়ি রাখা হইতে তবন পরা পর্য্যন্ত কোথাও অন্য সম্প্রদায়ের প্রভাব লেশমাত্র ছিল না। ইঁহার বাহিরের এই ঔদার্য্য পারিবারিক কড়াকড়ির পাশাপাশি চলিয়াছে, কোনদিন তাঁহাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারে ঠোকাঠুকি লাগে নাই। ফলে, পরবর্ত্তী বংশধরেরা সেই ছাঁচেই গড়িয়া উঠিতেছিল এবং

কাসেম অতি সহজেই পাড়ার অন্যান্য ছেলের সহিত মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিল, গ্রামের হইয়াও গ্রাম্যভাব ইহাঁদের ছিল না।

সে খুসী হইয়া সকলকে সুপারি দিল।

প্রতুল বলিল, ভারী মিষ্টি।

একজন বলিল, সত্যি।

স্কুলে টিফিন পিরিয়াডে মার্ব্বেল খেলিয়া প্রথম ঘণ্টায় সবাই এইমাত্র ক্লাশে উঠিয়া আসিয়াছে। মাষ্টারের আসিতে বিলম্ব আছে। প্রতুল অমূল্যর কাছে আসিয়া বলিল, এই, চক আছে? অমূল্য বলিল, না।

প্রতুল হাসিয়া বলিল, ভেড়াৎ ছেলে।

অঙ্কের মাষ্টার শ্রীনাথবাবুর সম্মুখের দাঁত ছিল না; ভারী কড়া মাষ্টার; বেত ছাড়া কথা বলেন না। তিনি যখন বলেন, ভেড়া ছেলে, তখন শোনা যায় ভেড়ার অথবা ভেড়াৎ ছেলে। ছেলেরা অহোরহ অনুকরণ করে। কিন্তু

অমূল্য বলিল, তুই যে আমায় ভেড়ার ছেলে বলসি! আসুক স্যার!

এই পিরিয়াডেই সেই মাষ্টার। অমূল্য নালিশ জানাইল। প্রতুল কৈফিয়তে মাষ্টারবাবুরই নকল করিয়াছে নিবেদন জানাইল। প্রতুলকে সে দামও দিতে হইল। বাদীর ক্ষতিপূরণ বাবদ দুই, বেয়াদবির জন্য দুই; দুইয়ে দুইয়ে চার; বেতও অঙ্ক জানে।

বড়দের হাতেলেখা মাসিক-পত্রখানা প্রতুল উল্টাইয়া পাল্টাইয়া

দেখিতেছে; হাতের লেখা কী স্পষ্ট ও সুন্দর। 'ক'টা লিখিয়া এমন করিয়া একটা টান দিয়াছে, 'ট'টা কেমনতর যেন; সমস্তটা মিলিয়া লেখাটা ভারী সুন্দর একেবারে। এইরকম ধারা লিখিতে পারিলে মাষ্টারের আর নম্বর কাটিবার জো নাই। আর মলাটের ছবিটা কি চমৎকার! মোটা অক্ষরগুলি নিশ্চয়ই ঘষিয়া লেখিয়াছে; তার 'হাতে খড়ির' লেখাগুলি মনে হইল; শ্লেটের উপর হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে কেমন মোটা হইয়া হইত। এই যে একটা কবিতা:

ছুটে গিয়ে নিলাম হাতে
ধুতিখানা একটু তেল,
নদীর জলে স্নানের সাথে
ধুয়ে দেব যতেক ভেল॥

'তেল আর ভেল,' তা ভেলটা কি, প্রতুল ভাবিতে লাগিল। এই শব্দ তো সে পায় নাই। একটা নতুন শব্দ পাওয়া গেল, নিশ্চয়ই এর একটা মানে আছে; বড়দা ওঁরা কলেজে পড়েন...... ভাল কথা, দেখি, ওঁদের কোনো লেখা আছে কিনা। একপাতা দুইপাতা করিয়া প্রতুল সব কয়টা পাতাই উল্টাইল, কোথাও তাঁহাদের নাম পাইল না। ভয়ানক নিরাশ হইল। ভাবিতে লাগিল, লেখাটা কি এতই কঠিন যে, ইঁহারা কেহই লিখিতে পারলেন না, পারিলেন কয়েকজন মাত্র। তবে তো তাঁহাদের অদ্ভুত ক্ষমতা! কিন্তু তেল 'ভেল', কীরকম সোজা-সোজা ঠেকে। এতই কি অসম্ভব? মোটে পারা যায় না? চেষ্টা করিলে পারিব না? হঠাৎ একটা কবিতা মনে পড়িল,—'পারিব না একথাটি বলিও না আর; পাঁচজনে পারে যাহা'—পাঁচজনে পারে নাকি? প্রতুল চারিদিক চাহিয়া নিজের একখানা খাতা টানিয়া লইল। কলম লইল; বার বার দোয়াতে কলম ডুবাইল, কি লিখিবে? য়্যাঁ, কি লিখিবে? প্রথম ভাগের মিলগুলিও কিন্তু বেশ, করকর খরখর,

কিন্তু কী লেখা যায়। প্রতুলের মাথা ঘুরিতে লাগিল; কেবল জানা কবিতাই মনে আসে: "পিপীলিকা পিপীলিকা"—ধেৎ, "ছোট পাখি, ছোট পাখি", নাঃ, ভারী মুস্কিল তো। আচ্ছা, এক লাইন, মাত্র এক লাইন নকল করিবে। "ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়, ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।" যাঃ, দুই লাইন হইয়া গেল। আর নাঃ। মৃত্যু কথাটা তাহার মাথায় ঘুরিতেছে, তাহারই সূত্র লইয়া বহু চিন্তার পর লিখিল: প্রতুল নিজের কবিত্বে আশ্চর্য হইল, উপরের দুই লাইনের মত নহে তবু মিলিল তো।

কোনপ্রকারে অশ্রুতপূর্ব্ব একটি কবিতা যখন নামিল, সে সঙ্কল্প করিয়া ফেলিল, বড়দের মত সে-ও একটা পত্রিকা বাহির করিবে। বাহির হইয়া ইহার উহার কাছে কথাটা পাড়িল, একপ্রকার সকলেই রাজী হইল, অশ্বিনী মুহুরী কাগজ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু কি নাম? বড়রাই ঠিক করিয়া দিলেন, নাম হইবে "উদ্যম"।

সৌরীন বলিল, আমিও লিখব, যা। লিখিল অনেকেই; সবই কোন-না-কোন গল্পের বা কবিতার ছাপ; বড় জোর নামের অদল বদল অথবা নিজস্ব দুই এক লাইন। প্রতুল সগৌরবে তাহার কবিতাটি তুলিল। মেজদা পড়িয়া বলিলেন, এযে একেবারে নকল রে!

প্রতুল ক্ষুণ্ণ হইল, বলিল, দু'টো লাইন মাত্তর; পরের লাইনগুলো?

ফিতুবাবু ছিলেন মেজদার সঙ্গী। বলিলেন, তা বটে, অরিজিন্যালিটি আছে বটে। বলিতেই সকলে হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িলেন। কিন্তু উদ্যম বটে প্রতুলের। সে মোটেই নিরুৎসাহ হইল না, রাগ করিয়া কবিতা লিখিতে লাগিল। হয় না, তবু হইতেই হইবে। তা কি হয়? সমস্ত সংসারটায় পাঁচজনের মধ্যে এই পার্থক্যে সে ভয়ানক বিরক্ত হইল। বড় হইলে সে

পারিবে ? তাহারই বা ভরসা কি ? কোন সমাধানে পৌঁছাইতে না পারিয়া নিজের অযোগ্যতায় বিরক্ত হইল।

দুপুরবেলা আজ থিয়েটারের কথা আছে। থিয়েটারটা লুকাইয়া করিতে হয়, নহিলে সকলেই যার যার বাড়ীতে গালিগালাজ খায়। প্রকাশ হইয়া পড়িবার কোনো পথই বন্ধ থাকে না। কেননা, নটেরই সংখ্যা বেশী হইলেও, শ্রোতাও কিছু সংগ্রহ করিতে হয় এবং তাহারা প্রায়ই অবোধ শিশুপাল হইলেও স্বীকারোক্তির বেলায় কেহ কম যায় না। গোপন থাকিবার মধ্যে এক পোড়োবাড়ীই থাকে বটে, কিন্তু সন্তর্পণে পা ফেলাও যেমন দুঃসাধ্য, অতগুলি ছেলে একটা খালি বাড়ীতে যে গুঞ্জন তোলে তাহাতে বয়স্করা সচকিত না হইয়াও পারেননা, বিশেষ বয়স্কদের মধ্যে যদি তেমন অতি শাসনদক্ষ এবং অতি উৎসুক কেহ থাকেন তো কথাই নাই। হয়তো কাকের চোখ বোঁজার মত কেহ একটা চাদর লইয়া ছুট দিতেছে, তিনি দেখিয়া বলিলেন, 'ওকী রে ?'—অথবা—'কোথা যাসরে ?' কিশোর চোর পলাইয়া গিয়া সঙ্গীদের সহিত জুটিলে বলে, 'বড্ড বেঁচে গেছিরে, সুরোর কাকা যে তাড়া করেছিল!' কিন্তু বাঁচিয়া যে যায় নাই, পরক্ষণেই হয়তো তাহা প্রমাণিত হইয়া যাইত। কি হচ্ছেরে সব, বলিয়া সেই মূর্ত্তিমান দেখা দিতেন এবং টাঙানো কাপড় বা আলোয়ান ও আরও দুই একটি বাড়তি পোষাক দেখিয়া বলিতেন, ব্যঙ্গ ও ভর্ৎসনার স্বরেই বলিতেন, থ্যাটার, থ্যাটার হচ্ছে! ভাগ! অথবা যাহার হয়তো পরম দুর্ভাগ্য সে ইতিমধ্যেই সাজিয়া বসিয়াছে। সাজ আর কি ?—কাঠকয়লা ঘষিয়া ভুরু গোঁফ দাড়িতে খানিকটা বুলাইয়া দেওয়া অথবা লাল ইঁটের গুড়ো এক চিমটি গালে বা ঠোঁটে লাগাইয়া রাখা : বেশীর ভাগটাই কল্পনা করিয়া লইতে হয়। যেমন আমি রাজা বা মন্ত্রী বা সেনাপতি। মুকুন্দ দাসের যাত্রায় সুবিধা এই, মাথায় 'মুকুন্দ দাসের' পাগড়ী থাকিলেই হইল; বড় জোর সৌষ্ঠব হিসাবে টিনের কতকগুলি চাকতি গলায় ঝুলাইয়া মেডেল

করিল। আশ্চর্য্য কল্পনা শক্তি, কি শ্রোতার কি নাট্যকারের! যাহাই হউক, যে সাজিয়া বসিয়াছে সেই পরম দুর্ভাগার কথা হইতেছিল। অভিভাবকের সে যদি আয়ত্তের হয়, তবে তো দুই চাটি এবং রং বেরং এদিক ওদিক, অন্য সবাইর উঁকি ঝুঁকি ও তেমন অবস্থা বুঝিলে পলায়ন। বেচারার কষ্টের শেষ এইখানেই নহে, অভিভাবকটি কেমন করিয়া কি ভাবে উহার মাথায় চাটি মারিল তাহার পুনরভিনয় সঙ্গীমহলে বহুদিন যাবৎ চলিবে, বাক্যে নহে কার্য্যে পর্যন্ত, আর অপর সকলে কী নিষ্ঠুর ভাবেই যে তাহা উপভোগ করে! বস্তুতঃ অপ্রিয় বাক্য (সত্য বা অসত্য) বা অপ্রিয় কার্য্য শিশু-কিশোর-তরুণেরা যেমন করিতে পারে, মানুষের অন্য পর্য্যায়ে কেহই তেমন পারে না; ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আক্রমণে ইহারা যেমন আনন্দ ও তৃপ্তি পায় আর কেহই তেমন পায় না। গোপন অন্যায় ব্যাপার মাত্র দুই জনে মিলিয়া করিলেও একে অপরের কুৎসা সর্ব্বসমক্ষে রটাইতে কোন দ্বিধাই বোধ করে না। "বোলে দোব" কথাটি যেন সকলের মাথার উপর তরোয়ালের খোঁচার মত; ভয়ের আর সীমা নাই। হয়তো সবটা মিথ্যাই, সবটাই একেবারে ধাপ্পা, কিন্তু ঐ শব্দ দুইটির এমনই অদ্ভুত রহস্যময় শক্তি যে, অজ্ঞাত আশঙ্কায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তি দুর্ব্বল না হইয়াই পারে না। তবুও সবই হয়, সকলেই সকলকে অবিশ্বাস করিয়াও বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করিয়াও অবিশ্বাস করে। এমন করিয়া ঘাতপ্রতিঘাতে কেহই বিশ্বাস্য নহে এই ধারণাটাই বদ্ধমূল হইয়া যায়।

সুরুতে তেমন কোন দুর্ঘটনা আজ ঘটিল না।

কাজ এমন কী-ই বা, তবুও 'সিন্' হিসাবে কাপড়ের একটা কোনা ধারার বেড়ার সঙ্গে টাঙাইয়া নামিয়া আসিতেই প্রতুলের মনে হইল, এই যে বিরাট দুর্ভর কাজ তাহা সে একাই করিতেছে এবং যখন দেখিতে পাইল অদূরেই একদল জটলা করিতেছে ও চাপাস্বরে কথাবার্ত্তা বলিতেছে, প্রমথটা দাঁত বাহির করিয়া

হাসিতেছে পর্য্যন্ত, তখন আর তাহার ধৈর্য্য রহিল না ; একটানে বাঁধা কাপড়টা খুলিয়া, কারণ ওটা তাহার নিজের, তাড়াতাড়ি পোঁটলা করিয়া গম্ভীর মুখে সোজা রওনা হইল। গমনোদ্যত প্রতুলের দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ের মুহূর্ত্তটা কাটিয়া গেলে প্রমথই জিজ্ঞাসা করিল, কি রে যাচ্ছিস নাকি ?

প্রতুল যাইতে যাইতে বলিল, যাব না ? তাহার পর তাহাতে তৃপ্ত না হওয়ায়, বোধ হয় মনে হইল তেমন শক্ত তো কিছুই বলা হইল না, তাই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তোমরা সব দাঁত দেখিয়ে হাসবে আর আমি একাই খেটে মরি। যাব না কেন ?

প্রত্যুত্তরে প্রথমটা সকলেই একটু থমকাইয়া গেল। তাহার পর গজু বলিল, চল না কি করতে হবে।

প্রতুল বলিল, কি করতে হবে ? কি করতে হবে তোমরা আর জাননা ? যাও, আমি ক'রব না।

প্রমথ বলিল, আমরা একটা কথা বলছিলাম।

গজু সঙ্গে সঙ্গেই বলিল, তোকেও বলতাম।

প্রতুল বলিল, আচ্ছা, আর বলতে হবে না। নিজেরা সব এদিক ওদিক গল্প করবে…প্রতুল কিন্তু যাইবার আগ্রহ তেমন আর দেখায় না।

একটু থামিতে দেখিয়া প্রমথ আগাইয়া বলিল, আগে শোন, তারপর বলিস।

প্রতুল বলিল, শুনতে চাই না। কিন্তু শুনিতে সে চায়। তাই, যখন দেখিল শুনিতে চাহে না বলায় উহাদের বলিবার উৎসাহও যেন কমিয়া আসিতেছে, তখন বলিল, সেই কখোন থেকে বলছে 'বোলব' 'বোলব' বল'ছেই না, এরকম করলে কে শুনতে চায় ?

প্রমথ বলিল, তুই তো শুনতে চাস না।

প্রতুল রাগিয়া বলিল, বললে তো শুনব ?

গজু ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া প্রতুলের কানে কানে কি বলিল।

প্রতুল বলিল, যাঃ।

প্রমথ বলিল, বারে, আমি নিজে দেখলাম।

প্রতুল বলিল, দেখেছিস কীরকম অসভ্য? একবার বয়কট হল তবু লজ্জা নেই। এবার কিন্তু, ভাই, ভীষণ বয়কট করতে হবে। কিছুতেই আর ক্ষমা নেই।

বয়কট এক নিদারুণ ব্যাপার। প্রত্যহ দেখা হইলেও কেহ তাহার সহিত কথা বলিবে না, কেহ তাহাকে খেলিতেও লইবে না। সে অসম্ভব কাণ্ড; এমনি সামাজিক চাপ। তবুও—

সকলেই সায় দিল।

একজন বলিল, কিন্তু যদি থিয়েটারের কথা বলে দেয় ভাই?

কেহই জবাব দিল না।

পরে অপর একজন কহিল, বলুক গে।

কেহ বলিল, কী বলবে, ইয়ার্কি নাকি, এক থাবড়া মারব না?

কেহ বলিল, না রে, থিয়েটার থাক।

যে-বলিয়াছিল, বলুকগে, সে-ই বলিল, থাক তবে।

প্রতুল বলিল, কিন্তু যখন করব বলেছি করবই।

প্রমথ বলিল, আমি কিন্তু গাইতে পারব না।

প্রতুল রুখিয়া বলিল, কেন? কী ভীরুরে!

প্রমথ বলিল, বেশ ভাই, শেষটায় কেউ শুনে ফেললে মার তো আমিই খাব।

প্রতুল আবার যাইবার উপক্রম করিয়া বলিল, হরিহরকে তোমরা বয়কট করবে, না, ছাই করবে। আর কোনদিন যদি থিয়েটার করি, কী বলেছি। যাঃ, বলিয়া চলিয়া গেল।

আবার বিকালবেলা সকলেই ছোট্ট খেলার মাঠটায় জড় হয়। উপর ক্লাশের অনেকেই আসে।

অনিল সেকেণ্ড ক্লাশের ছেলে; পড়াশুনায় খুবই ভাল ছেলে; মামার বাড়ী থাকিয়া পড়ে। পোষাক পরিচ্ছদের দিকে নজর

দেওয়া সম্ভবও ছিল না, নজর তাহার ছিলও না। তেমনি অসম্ভব একগুঁয়ে। পরবর্ত্তীকালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় 'তারকা' পাওয়ায় পরেশ পণ্ডিত বলিতেন, মানুষের পরিচয় পোষাকে নেই, আদ্দি আর এসেন্সের মানুষও পরীক্ষায় শূন্য পায়, আবার ফুটো গেঞ্জি-ওলাও তারকা পায়। ফুটো গেঞ্জি মানে অনিল, তাহার গেঞ্জিতে ছিল সহস্র ছিদ্র কিন্তু তাই গায় দিয়াই সে স্কুলে হাজির থাকিত। তাহার হাতের লেখায় তেমনি ব্যস্ততা ছিল, বুঝিবার বড় একটা জো ছিল না। সেই অনিল ঐদিক হইতে আসিতে আসিতে বলিল, অমিত, এই অমিত, নরেন সত্যানুসন্ধানে গেছে।

সবাই উদগ্র হইয়া বলিল, মানে, মানে, ?

অনিল বলিল, বুঝলি না? সত্যের অনুসন্ধান—সত্যানুসন্ধান।

অমিত বলিল, কোথায় গেছে বললি ?

অনিল বলিল, গেছে মানে ভাগারাম। মা'র বাক্সটির চাবিকাঠি ভেঙে দশটি টাকা নিয়েছে, নিয়ে, একটি শ্লিপ কাগজে লিখেছে, "আমি সত্যানুসন্ধানে চল্লাম; খোঁজ অনাবশ্যক।" অর্থাৎ সত্যানুসন্ধানের জন্য এই দশটি টাকা সংসারীর ওপর ট্যাক্সো। বলিয়া হাসিতে লাগিল, উপস্থিত অনেকেই হাসিল। অনিল বলিল, হিমালয়-টিমালয় যাবে বোধ হয়।

অমিত বলিল, পড়াশুনোয় কিন্তু ভারী তুখোর।

অনিল হঠাৎ বলিল, ভালো কথা, এই বাইশ-থিওরেমের চার নম্বর একষ্ট্রাটা তোর হ'য়েছে? আয় তো করি, কি-রকম মিলছে না যেন। বোস না?

আমিন বলিল, এক্ষুনি? খেলবি না?

অনিল বলিল, বোসতো, বলিয়া লাল ইঁটের রাস্তার খানিকটা হাত দিয়া ঝাড়িয়া লইয়া ফিগার আঁকিতে লাগিল। ওরা ছাড়া সকলেই খেলিতে গেল।

খেলা দাড়িয়াবান্ধা। বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ সকলেই

চমকাইয়া দেখিল, রাস্তায় অনিল ও অমিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়া গোঙাইতেছে।

অমিত বলিতেছে, ইউ আর এ লায়ার— অনিল বলিতেছে, ইউ আর এ হ-রিবল লায়ার—

পরে জনতা আসিয়া গেলে উভয়ের রেশ কমিল বটে, কিন্তু ঘটনার অনেকক্ষণ পরেও প্রতুলের চোখের সম্মুখে উহাদের ফোঁস ফোঁসানির দৃশ্য বারে বারে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল এবং কানে একটি শব্দ থাকিয়া থাকিয়া শুনিতে লাগিল ঃ হরিবল লায়ার।

বাড়ীতে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিতে হয়। নহিলে মার। ও বিষয়ে বাড়ীর কাহারও ভিন্ন মত নাই। এই বাড়ীতে রাত করিয়া খাওয়া কাহারও অভ্যাস নাই, তাই খাওয়ার পর পড়া। পানুরা বলে, পড়িস কি করে? পড়ে অবিশ্যি, কিন্তু পড়িতে পারে না সত্যি, অনেকবারই মেজদার ধমকে বা চুলের টানে জাগিতে হয় ঃ যা, চোখে জল দিয়ে আয়, উঠোনে এক চক্কর দিয়ে আয়। কিন্তু না খাইয়াও পড়া যায় না। কিন্তু আজ কেহই কোন তাগাদা দিল না। কি একটা কাজে সবাই ব্যস্ত। কথাটা শীঘ্রই খোলসা হইয়া গেল। দাদাদের বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে, কোথায় যাইবার একটা কথা উঠিয়াছে। বাবা-মা কেহই যাইবেন না, সৌরীন আগেই তাহার মাকে লইয়া অন্যসূত্রে চলিয়া গিয়াছে; কেবল তাহারা চার ভাই যাইবে। ছোটরা সকলেই এখানে থাকিবে, হ্যাঁ রুক্মিণীও যাইবে, এই সুযোগে কোথায় নাকি একটা কথা চলিতেছে, তাহাদের দেখাইয়া আসিবে। স্কুল বন্ধ হইলেই যাওয়া হইবে বলিয়া প্রতুলের মনেও কোন খচখচি থাকিল না।

একদিন তাহারা সত্যিই গাড়ী চাপিয়া বসিল। এক জায়গায় ষ্টীমারে পার হইয়া ইলিশ মাছ আর গরম ভাত খাইতে বড় ভাল

লাগিল। ছোড়দিও খাইল। তাহার পর যে গাড়ী, ওরে বাবা, কানে ঝিঁ ঝিঁ লাগে, ভাঙ্গা, মনে হয়, এই ঝরঝর করিয়া সব পড়িয়া গেল। ছোট্ট কামরা; ছোড়দি মেয়ে কামরায়; প্রতুলের কামরায় আরও দুইজন আরোহী ছিল; একজনের একেবারে বিড়ালের মত চোখ; বেশ আলাপী, বলিল, দেখুন, য়্যাটাং নাই তার ফ্যাটাং আছে; গাড়ীর তো এই অবস্থা, কিন্তু দুপুর রোদেও আলো জ্বলছে ঠিক।

এই বৈসাদৃশ্যে সবাই হাসিতে লাগিল। কিন্তু লোকটির বলিবার ধারাটা প্রতুলের আরো ভালো লাগিল। সেজদা আর সে চুপি চুপি বারবার বলিতে লাগিল, য়্যাটাং নাই তার ফ্যাটাং আছে। অতি সন্তর্পণে বলিতে লাগিল। মেজদাকে তাহাদের বড় ভয় করিত। তাঁহার বেত ও কথার শাসন উভয়ই তাহাদের নিদ্রায়-জাগরণে আহার-বিহারে সতত ক্রিয়া করিত।

তারপর প্রদ্যোৎনগর। প্রদ্যোৎনগরের কাঁচা গোল্লা। বড়দা ছুটিয়া গিয়া কয়েকটা ছোট—প্রতুলের চোখে বড়ই ছোট ঠেকিল—ছোট টিপে লইয়া আসিলেন। খুব নাকি নামকরা জিনিস। বিড়াল-চোখী বলিল, তেমনটি আর নেই।

এই কথাটি বহুবার শুনিয়া শুনিয়া প্রতুলের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, কোন জিনিসই আর তেমনটি থাকে না নাকি? তেমনটি আর নাই, এই চীৎকার তো সর্ব্বত্র। কেন?

ওঃ পথ আর ফুরায় না। সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

তাহার পর গঞ্জের পর গঞ্জ, আরে বাপ, কত বড় নদী! কত নৌকা, য়্যা! একখানা নৌকায় তাহারা উঠিল। প্রতুলের সে কি ভয়! কিন্তু আশ্চর্য্য, তাহারা ডুবিল না। আবার এক গঞ্জ। আবার হাঁটা। আর কি ছাই পথের শেষ আছে? সেই শেষটি কোথায়? কোথায় তাহারা যাইতেছে? কীরকম সব কাঠের পুল—এই রকম উঠিয়াছে, এই রকম সোজা গিয়াছে, আবার এই রকম ঢালু নামিয়াছে, ফাঁক ফাঁক কাঠ।

কদ্দূর, বড়দা? প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল।

এই তো, এই কাছেই, বড়দা বলিলেন।

সেজদা কিছু বলে না।

কিছুদূর হাঁটিয়া আবার প্রতুল বলে, আরো অনেক নাকি?

বড়দা বোঝেন ইহাদের কষ্ট হইতেছে, কিন্তু উপায় নাই। অনেক কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া বলিলেন, না—না, এই তো এসে পড়লাম।

ছাই। বলিয়া প্রতুল বসিয়া পড়ে। বড়দার মুখের শুষ্ক হাসি মিলাইয়া যায়, চোখের জল রোধ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

কিন্তু সেজদা কিছু বলে না।

বিবাহের বাড়ী, হৈ চৈ। সকলের চাইতে আশ্চর্য্য হইল প্রতুল তখন, যখন দেখিল, বাজনা তো নয়, এযে ব্যাণ্ড, কতরকম যন্ত্র!

নানাপ্রকার আনন্দ, ধুম, হট্টগোলের মধ্যে কতকগুলি ব্যাপার প্রতুলের মনকে পীড়িত করিল বটে; কিন্তু উহাদের প্রভাবও সে এড়াইতে পারিল না। বরপক্ষীয়দের মধ্যে কন্যাপক্ষীয়দের উদ্দেশে যেসব অসভ্য ও নোংরা সমালোচনা শুনিল, তাহাতে তাহার মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি না করিয়াই পারিল না। এক পক্ষের কথা শুনিয়া তাহার নিশ্চিত ধারণা হইল, এই সব বিবাহের সূত্রে একটা অসদ্ভাবের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল মাত্র। উভয় পক্ষেরই হয়তো উচ্চভাব বা কৌলীন্য-উগ্রতা, কিন্তু তাহা কি এতই বিশ্রী! তথাপি, প্রতুলের কাছে স্বপক্ষীয়দের সকল কথাই সমীচীন মনে হইল এবং প্রতিপক্ষের

উপর তাহার যেন বিদ্বেষের সীমা থাকিল না ; থাকিল না বলিয়া অজানিতা অপরিচিতা নবাগতদের উপর অনায়াসেই অবিচার করিয়া বসিল ; এই সকল ক্লেদ মলিনতার কোন কিছুই যে তাহার ভাবী আত্মীয়াদের স্পর্শ করে নাই, ইহা সে ভাবিতেও পারিল না। উপরন্তু এপক্ষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে রায় প্রকাশ হইয়া গেল, তাহাকে সে নির্ব্বিচারে সমর্থন করিয়া গেল।

জোড়া-বিবাহের গোলযোগ চুকিয়া গেলে, রুক্মিণীকে দেখিতে লোক আসিল। মস্ত বড় কুলীন তাঁরা। বাহিরের ঘরে প্রতুল আলাপ জমাইয়া বসিল। আলাপে আলাপে প্রতুল রুক্মিণীর সৌন্দর্য্য সম্পর্কে কি যেন একটি কথা বলিয়া ফেলিল।

সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, য়ঁ্যা ?

প্রতুল খানিকটা অপ্রস্তুত হইল। কিন্তু কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা, প্রতুলের উহা একান্তই ছেলেমানুষি অনুমান। তীক্ষ্ণ সমালোচনার সূক্ষ্ম ছাকনি দিয়াও রুক্মিণী নির্ব্বিঘ্নে গলিয়া গেল এবং মেয়ের রূপ ও পিতার রৌপ্য উভয়ের পরিচর্য্যায় লক্ষ্যপথ প্রশস্ত হইয়া গেল।

ছুটির অবসানে পড়াশুনার তাগিদে প্রতুল ও সেজদা সৌরীনের সহিত শ্যামনগর রওনা হইয়া গেল। ছোট ডিঙি, বর্ষার কল্যাণে ইহাতেই গঞ্জে পৌছাইয়া বড় নৌকা করা হইবে। এক মাঝি আর অত্যন্ত বিশ্বস্ত চাকর কালীচরণ। ছইয়ের নীচে বিবাহের বাসনাদি। মাঝির নাম চন্দ্র। সৌরীন উৎসাহিত হইয়া বলিল, পাল তোল চন্দ্র, আমি বৈঠা নিচ্ছি। পাল তোলা হইল। সৌরীন বলিতে লাগিল, আয় পবন, দুধভাত খাবি তো মামাবাড়ী আয়। পবন আসিয়া গিয়াছিল, নৌকা তীরবেগে ছুটিতেছিল ; সৌরীনের উৎসাহের অবধি নাই : ছাখ চন্দ্র, আর একটা বৈঠা থাকলে বড় নদীটা এই ডিঙিতেই পার হতাম। আয় পবন…

এইবার পবন সশব্দে সাড়া দিল ; সঙ্গে সঙ্গে সৌরীন চীৎকার করিয়া উঠে—খুলে দে ; খু…

তারপর জলে জলময়।

প্রতুল সাঁতার জানিত না। রূপালি জলতরঙ্গ তাহাকে ছইশুদ্ধ প্রথমে নরম কাচের মধ্যে চাপিতে থাকিল, তাহার পর অন্ধকার, আরও অন্ধকার। কি মনে করিয়া প্রতুল হাত নাড়িল ; আবহাওয়াটা যেন পাতলা হইল, চাপা ছই সরিয়া গেল। ঢেউয়ের খেলা। আবার পাতলা সবুজ তরল কাচের পথ, আবার আলোর আভা, আবার আলো। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ঢেউয়ের চাপ। প্রতুলের কাঁদিবার অবসর নাই, ভাবিবার সময় নাই, এক অদ্ভুত বিহ্বলতা। আবার কে যেন ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল ; হ্যাঁ, আবার আলো, কিন্তু তখখুনি···

একটা আর্তনাদ : ঐযে ঐযে···

কালীচরণ একপ্রকার ডুব দিয়াই প্রতুলকে ধরিল, সৌরীন আগাইয়া আসিল। সেজদা কোথায়? ঐ পাট গাছ ধরিয়া ঝুলিতেছে। চন্দ্র? সেও ঐযে। ঐ ডুবো ডিঙিটা—কাৎ হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে। কাপড়ের গাঁঠরীটা ঢেউয়ের উপর খেলিতেছে। বাসন কোষণ? নাই।

সৌরীন বলিল, রসো কালীচরণ, ডিঙিটা পাকড়াও দেখি, হ্যাঁ, ওটার ওপর ওকে রাখ ·· ওঃ যাঃ

অর্থাৎ ঐ কাৎ হওয়া ডিঙি আবার তলাইয়া যাইতে চায়। পূর্ব্বেকার এবং এখনকার পরিত্রাহি চীৎকারে অন্য নৌকা সাহায্যে আসিয়া গেল। দিগম্বর প্রতুল ও সেজদা নৌকায় উঠিল : সেজদা নিশ্চুপ ; প্রতুল কাঁদিয়া উঠিল। আর সৌরীন নিস্তব্ধতার দেনা মিটাইয়া দিতে মরণান্ত চীৎকার করিয়া উঠিল। কালীচরণ আর চন্দ্র চুপ করিয়াই কাজ করিয়া যায়। উদ্ধারকর্ত্তারা বলে : আমরা ভাবতেছিলাম পোলা-পানেরা ডুবাডুবি খ্যালতেছে।

ঘটা করিয়া শনি-সত্যনারায়ণের পূজা হইয়া গেল এবং এই উপলক্ষে ভগবানের দয়ায়ই যে সে বাঁচিয়াছে এই কথা শুনিয়া

শুনিয়া প্রতুল একটা অস্পষ্ট কিসের যেন ইঙ্গিত পাইল। সেই আলো অন্ধকারে গ্যাংরা ঠাকুরের পানদোক্তা-লালা-মিশ্রিত মুখের পুঁথি পাঠ তাহাকে একবার কাঁদাইল, একবার ভাবাইল।

এইবার অধিকতর যত্নে প্রতুলেরা শ্যামনগরে পৌছাইয়া গেল।

বিমলার ক্ষুরধার সমালোচনায় দেবীকান্ত খান খান হইয়া গেলেন।

বাড়ীতে বৌ আনবে, তা অত হাতজোড় করে কেন? কৌলিন্যের দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না, তবে সেখানে টাকা দিয়ে পথ তৈরি করতে হবে এমন কি কথা। জানি গো জানি, বলবে টাকা তো আর সত্যিই দিইনি। না দিয়েছ, নিতে বাধা ছিল কি? সেই ছোট হয়েই তো গেলে, সোয়াশো টাকা আবার দেয়া-থোয়া। রূপ হলেও হত, শুনেছি নাকি সে ব্যাপারে আর যাই হোক, আমাকে ডিঙোতে পারে নি। লেখাপড়া? চুলোয় যাক পুঁথি-পত্তর, মেয়ে মানুষের আবার লেখাপড়া, বিবিয়ানা তো আর চলবে না, হেঁসেলে সেই উনুন গুঁতোতে হবেই। পটেশ্বরী হয়ে থাকবার রূপও নেই, ব্যবস্থাও নেই, এখানে হতেও পারবে না। তবে? গুণ গুণ গুণ, কী গুণটা আছে শুনি? সেলাই করে? বলি, দর্জি খরচ তো আর বাদ পড়বে না? বালিশের অড়ের কোনে একটি ফুল তুললেই কি, না তুললেই কি? আর ও সব লেখাপড়াওলা মেয়েরা রান্নাঘর কি জানে না, বই নিয়ে ঘেঁতিয়েছে, ভুলেও ও দিকটা মাড়ায় নি, লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে ত বসে আছে চুল ঢুলিয়ে....

দেবীকান্ত অতিষ্ঠ হইয়া বলিতেন আঃ!

কথাগুলি দ্বিতীয় বধূকে উপলক্ষ্য করিয়া। দেবীকান্তের দ্বিতীয় পুত্রের এই বিবাহে বিমলার প্রবল আপত্তিও ছিল। কৌলিনত্বের দাবীতে আর্থিক প্রাপ্তির সঙ্কীর্ণতা।

বিমলা বলিল, আঃ কেন?

কিন্তু যেদিন সত্য সত্যই বিমলার এই অনাকাঙ্ক্ষিত বধূটি এই

বাড়ীতে পা দিল, সেদিন বিমলার হিংসা একদিকে যেমন চতুর্গুণ হইল, অন্যদিকে তেমনি আর সকলে বিমুগ্ধ হইল। হ্যাঁ গুণী বটে।

প্রতুল বলিয়া উঠিল ওটা কি মেজদা ?

মেজদা বলিলেন, তোয়ালে বোনবার হাত-তাঁত।

বিমলা বলিল, এই পুতু কোথা যাচ্ছিস, আচারের বোইয়মগুলো না ভেঙে ছাড়বেনা ছেলেটা।

ঝণ্টু বলিল, খাব, মা···

সঙ্গে সঙ্গে প্রতুল বলিল, চাটনি খাব।

বিমলা গুছাইতে গুছাইতে বলিল, কি আ-দেখলে রে।

বিমলা শীঘ্রই উপলব্ধি করিল বধুটি দেবীকান্তের দ্বিতীয় পুত্রের বটে, কিন্তু দ্বিতীয়ের ঝালটুকু ইহাতে নাই; নিরুত্তর নির্ব্বাক কর্ম্মীর প্রতি রোষ করিয়া রোষটা নিষ্ফল হইয়া পড়ে; তাহাতে রাগ বাড়ে বটে কিন্তু ধীরে ধীরে যখন বিমলার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সকল অসুবিধার কাজেই বধুটি ছড়াইয়া পড়ে, তখন সুযোগ খুঁজিয়া কোন্দল করিবারও আর উপায় থাকে না।

জ্যেষ্ঠ বধুটি যেমন নিশ্চুপ আসিল তেমন নিশ্চুপেই সময় চলিয়া যাইতে দিল। গ্রাম্য মেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ীর পরিচর্য্যার কথা শুনিয়াছে, পরকে আপন করিতে হইবে জানিয়াছে, কিন্তু তাহারও যে একটা সুচিন্তিত উপায় আছে, ইহা তাহার গোচর ছিল না। তথাপি ইহার নিরুপায় ভাবটির ভিতর এমন একটি সারল্য ছিল, যাহা কাহাকেও মুগ্ধ না করিয়া পারিত না। জ্যেষ্ঠের উপযুক্তই বটে। বিমলার রেশটুকুও যেন এই খানে খানিকটা কম বিকীর্ণ হইত। বিমলার এই ভাগাভাগিটুকু প্রতুলকে পরিচালিত করিল। বড়কে যেমন সে ভালবাসিত, দ্বিতীয়কে তেমনি সে এড়াইয়া চলিতে লাগিল। মনে হইত, মায়ের এই দৃষ্টিটুকু অত্যন্ত যথার্থ।

বড় বৌ দুপুরে ঘুমাইয়া পড়িলে প্রতুল ওরা লেপের পর লেপ চাপা দিতে থাকে, তবুও বৌর ঘুম ভাঙেনা দেখিয়া সকলেই ঐটুকু

উপভোগ করে। তারপর, বহু পরে প্রতুল হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলে বৌ'র সজাগ—সচকিত চাহনির দিকে তাকাইয়া কেহই হাসি চাপিতে পারে না; বৌ'র ঐ লজ্জাটুকু ভারী নরম ঠেকে।

খুব ভোর বেলা দড়াম করিয়া দরজা খুলিয়া কতদিন সুপ্ত বড় বৌদিকে যে প্রতুল সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার ঠিক নাই, কিন্তু প্রতুলের এই আকস্মিক প্রবেশকে উপলক্ষ্য করিয়া কোনদিন দুয়ারে অর্গল লাগায় নাই; প্রতুলের উৎসাহ ও আগ্রহ বড়-বৌ শিশুর মতই গ্রহণ করিত।

ইহারা যেদিন 'বাপের বাড়ী' যায় সেদিন প্রতুলেরা ষ্টেশনে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া কাহার কথায় সায় দিয়া প্রতুল বলিল, হ্যাঁ, সত্যি।

বিমলা বলিল, কি বলেছে রে?

প্রতুল বলিল, বলেছে, এবার মাথা ঠাণ্ডা হোল, বাঁচলাম, বলেনি সেজদা?

সেজদা কিছু বলে না। বিমলা শুধায়, মাথার কাপড় ফেলে দিলে বুঝি?

প্রতুল সোৎসাহে বলিল, হ্যাঁ।

বিমলা পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিল, ষ্টেশনে—অত লোকের মাঝে?

প্রতুল সেই সুরেই বলিল, হ্যাঁ।

সেজদা বলিল, না, মা, মেয়েদের বোসবার ঘরে, মেয়েরা ছাড়া…

বিমলা বলিল, তুই থাম, বোসবার ঘর বুঝি আর ষ্টেশন হ'ল না? হ্যাঁরে পুতু, বড় বৌও।

এইবার প্রতুল মুস্কিলে পড়িল, বলিল, হ্যাঁ, তাই যেন দেখলাম, একটুখানি লেগেছিল বোধ হয় খোঁপায়।

বিমলা গল্পের শেষে টীকা-টিপ্পনী যাহা কাটিল, তাহাতে আর কাহারও সমর্থন না থাকিলেও, বিমলার ক্ষান্তি নাই।

মেজদা বলিলেন, বড়দা, ঝুঁটিওলা পায়রা দুটো সেই যে উড়ে গেল আর তো এলো না।

বড়দা বলিলেন, শুনলাম, আর দুটো পায়রাও নাকি ও-বাড়ীতে পিটিয়ে মেরেছে।

মেজদা বলিলেন, য়্যাঁ।

বড়দা বলিলেন, ওদের সরষে খাচ্ছিল।

তাহার পরদিনও একঝাঁক পায়রার খোঁজ পাওয়া যায় না। ব্যাপারটা সকলের মনে খচখচ করিতে লাগিল।

দেবীকান্ত বলিলেন, এ তো বড় অলক্ষুণে ব্যাপার। ও-গুলো কাউকে দিয়ে দে। পায়রা শুনেছি লক্ষ্মী।

পায়রাগুলি মেজদার বড় আদরের। তাহার পক্ষে ইহা যে কি নিদারুণ তাহা সকলেই বুঝিল। সকলেরই বড় মায়ার পায়রাগুলো।

বিমলা বলিল, ঐ নিয়ে যখন এত হাঙ্গামা ও দিয়ে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যায়।

কথাটা কাহারও ভাল লাগিল না। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই একটা কাক অনাবশ্যকভাবে এবং অতিরিক্ত রকমের কর্কশকণ্ঠে ডাকিতে-ছিল। সেটি আরও খারাপ লাগিল। একসঙ্গে প্রায় সকলেই হৈ চৈ করিয়া কাকটিকে তাড়া করিল। কাক গেল বটে কিন্তু কাহারো সন্দেহ গেল না।

দেবীকান্ত বলিলেন, অমঙ্গল লাগল বুঝি সংসারে। বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

বিমলা বলিল লাগবে না? আমি তো এ-বাড়ীর কেউ নই?

তৃতীয় দিনে টেলিগ্রাম আসিল, বড়-বৌ জ্বরে গত হইয়াছে।

নিথর স্তব্ধতা। প্রতুলের চোখ ফাটিয়া বারে বারে জল আসিতে লাগিল। দেবীকান্ত মুষড়াইয়া পড়িলেন; বড়দা বিবাগী অবস্থায় কলিকাতায় পাঠ সমাপ্তিতে চলিয়া গেলেন। একটা অব্যক্ত ব্যথায় গোটা সংসার থমথম করিতে লাগিল।

বিমলা একদিন দেবীকান্তকে বলিল, গয়নাগুলো কি হবে?

দেবীকান্ত চমকাইয়া বলিলেন, কিসের?

বিমলা বলিল, সোনার বৌ না হয় ফাঁকি দিয়ে গেল, কিন্তু গয়নাগুলোর আর তেমনি হাত পা নেই।

দেবীকান্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন, এযে বড় লজ্জাকর।

বিমলা বলিল, এতে লজ্জা কিসের শুনি।

দেবীকান্ত বলিতে চেষ্টা করিলেন, সেগুলো যাকে উদ্দেশ করে দেওয়া হয়েছে, সেই যখন থাকল না...

বিমলা বলিল, বারে উকিলী বুদ্ধি, গয়না যাকে উদ্দেশ করে দেওয়া হয়েছে, সে তো বেঁচেই আছে, বৌ তো উপলক্ষ্য। নাও আজই একখানা চিঠি লে:খা।

দেবীকান্ত দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন।

কথাটার মীমাংসা হইতে না হইতেই বাধা পড়িল। ছোট ছেলে দুইটা কোথা হইতে হুড়মুড় করিয়া আসিয়া একটা ঝগড়ার প্রসঙ্গে যার যার পক্ষে ওকালতি সুরু করিয়া দিল এবং উভয় পক্ষের জবাব প্রত্যুত্তরে আবার ঘোরালো হইয়া উঠিলে বিমলা 'রায়' হিসাবে দুইটিকেই মারিতে লাগিল। সে এক অসহ্য ব্যাপার; বাড়ীর ছেলেপুলেরা আসিয়া জুটিল। দেবীকান্ত জীবনে কোন দিন যাহা কল্পনা করেন নাই, তাহাই কার্য্যে করিয়া বসিলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে বিমলার গালে এক চড় বসাইয়া দিলেন।

প্রতুল ওরা সকলেই এই অভাবিত ঘটনায় স্তব্ধ হইয়া গেল; একটু উল্লসিত হইল বুঝি। পরমাশ্চর্য্য এই যে, বিমলা ইহার পর একটি কথাও বলিল না।

ইহার সাতদিন পর দেবীকান্তের জ্বর হইল; বুকে কফের আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রথমে একদিকে, পরে দুইদিকে। ডাক্তার আসিল, মকরধ্বজ আসিল, টেলিগ্রামের উত্তরে বড়দা মেজদা আসিলেন, অক্সিজেন আসিল, কিন্তু দেবীকান্ত 'মানুষ মরণশীল' এই

সাদা স্বাভাবিক সত্যটাই নির্ব্বাক নিশ্চুপতায় সমর্থন করিয়া গেলেন।

স্ত্রীর মৃত্যু বড়দাকে যখন অনিবার্য্য বৈরাগ্যের পথে লইয়া যাইতেছিল, ঠিক তখনই বিরাট সংসারের দুর্ব্বহ ভার অকস্মাৎ এই বিবাগী মনের উপর নিষ্ঠুর পীড়নে চাপিয়া বসিয়া তাঁহাকে যৌবন হইতে সজোরে বার্দ্ধক্যে বসাইয়া দিয়া গেল; বড়দার সুপ্ত পিতৃস্নেহ দুর্ভেদ্য জালের মত আশ্রিতদের রক্ষা করিল বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার মানসিক ও শারীরিক যে ক্ষতি হইল তাহা সংসারে ভাবিয়া দেখিবার কেহই ছিল না। সেই হইতে সেই-যে তিনি এই পরিবারের অবিচ্ছিন্ন মায়ার একটা অংশে অত্যন্ত সঙ্গোপনে চলিতে লাগিলেন, বাহিরের লোকে এই সর্ব্বনাশের আভাস পাইত সেদিন যেদিন তাহাকে কোনো আমোদ উৎসবে পাওয়া যাইত না। কাছারী হইতে সোজা আসিয়া সেই যে জল-চৌকিতে বসিতেন, নিদ্রা ছাড়া তাঁহাকে আর কেহই টলাইতে পারিত না। দেবীকান্ত আয় ব্যয়ের দুইটা পথই এমন খোলা রাখিয়া গিয়াছিলেন যে, তাহারই সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে বড়দা নিজেকে পরিশ্রান্ত মনে করিতে লাগিলেন।

বাড়ীর ভীড় এবং একজনকে হারাইবার জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা-মত কুশাসন, হবিষ্যি, থানকাপড় ছাড়া খুব বেশী একটা দাগ প্রতুলের মনে অঙ্কিত হয় নাই। বিমলার আছড়াইয়া পড়িবার কথা মনে পড়ে; আর বারে বারে মনে হয়, কি নিদারুণ এই নিঃসহায়তা এবং একি নিদারুণ নিয়ম।

তখনও তাহাদের অশৌচ। খবরের কাগজ মারফৎ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল, ১৬ই ডিসেম্বর মহাপ্রলয় হইবে, পৃথিবীটা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। আশঙ্কায় উদ্বেগে সকলেরই দিন কাটিতে লাগিল। স্বভাবভীতু প্রতুলের মুখে অন্ন উঠিতে চায় না। প্রলয়, ধ্বংস-নিঃশেষ, কি অসহ্য স্তব্ধতা। জল জল জলময়; এতটুকু নহে, এক আঁজলা নহে, এক বালতি নহে, নদী নহে—কত কূপ, কত ইঁদারা তাহাতে ডুবিয়া যায়, থই মেলে না, সেই জলে হাবুডুবু খাইতে হইবে, ডুবিতে হইবে, নীচে নীচে, আরও নীচে কোথায় তাহার শেষ, কত বছরে, কত যুগে তাহার শেষ? সাঁতার সে আজ খানিকটা জানে বটে, কিন্তু সে কতটুকু, কতক্ষণ? ভাবিতেই প্রতুল আধমরা হইয়া যায়। এ সংসারে কিছুই থাকিবে না, পানু ওরা থাকিবে না, ঐ বড় আমগাছটা না, এই রাস্তা, হরিহরদের বাড়ীর কলের গান, মার্ব্বেল খেলা, প্রাইজ পাওয়া সব শেষ? য়্যা?

১৪ই ডিসেম্বর। মেঘ হইয়াছে বটে, অল্প অল্প। তা' অল্প বেশী হইতে কতক্ষণ? বর্ষা নামিবে, তুমুল বর্ষা, রেনি ডে বলিয়া স্কুল বসিবে না, রাস্তাঘাট ঘর বাড়ী···অসহ্য চিন্তা। ঐ গাছটা এমন দুলিতেছে কেন?

১৫ই ডিসেম্বর। তেমনই পাতলা মেঘ। ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ঝড় হইবেই, হুড়ুৎ করিয়া আসিয়া সব একাকার।

১৬ই ডিসেম্বর। চোখ মেলিতে ভয় হয়। এ কী। ইতিমধ্যেই সব জলময় হইয়া গিয়াছে নাকি? গভীর জলের রং নাকি নীল। সর্ব্বত্র নীল, আকাশ গাঢ় নীল। এই জলভেদ করিয়া সূর্য্য আলো দিতেছে নাকি? সূর্য্য তবে খসিয়া পড়ে নাই? বাড়ীঘর সবই তো রহিয়াছে?

মেজদা, আজকে না প্রলয় হবার কথা?

মেজদা বলিলেন, হবার তো কথা, হল আর কই?

প্রতুল বলিল, তাহলে আর হবে না?

মেজদা বলিলেন, দেখছিস না আকাশ কেমন নীল ?

প্রতুল বলিল, হবে না তাহলে ?

মেজদা বলিলেন, হলে তো জানতিস রে ! চল, নেয়ে আসি।

নদীতে আসিয়াও প্রলয়ের কোন চিহ্ন চোখে পড়িল না। আকাশ তেমনি নীল, স্বচ্ছ,সুন্দর ; সূর্য্য তেমনি দীপ্তিমান ; থান কাপড় তেমনি ফরফর করিয়া উড়িতেছে, শুখাইতেছে।

প্রতুল বলিল, ভালো করে ধর না কাপড়টা, এই, সেজদা ?

সেজদা বলিল, ভালো করেই তো ধরেছি।

প্রতুল বলিল, উড়ে যেতে চায় যে !

সেজদা বলিল, ভালোই ত, শিগগির শুকোবে।

যতীনবাবু স্নান করিতে আসিয়া বলিলেন, ও হে সত্যেন, কুশল সংবাদ আর জিগগেস করব না, কিন্তু কদ্দিন বাকী ?

বড়দা বলিলেন, এই বাইশ দিন গেল।

যতীনবাবু বলিলেন, তাহলে আর আটদিন। শাস্ত্রীয় নিয়মে কষ্টটাও বামুনরা কায়েতের ওপর দু খাবলা বেশী বসিয়েছে।

যতীনবাবু নিজে কায়স্থ।

বড়দা বলিলেন, না-না, কী আর এমন কষ্ট, বাবার মৃত্যুর কাছে এ তুচ্ছ।

যতীনবাবু বলিলেন, তা' বটে। কিন্তু বাবার মৃত্যুটা না-হয় ভগবানের ঘাড়ে চাপানো গেলো, মানুষের এই শাকের আঁটিটা ?

বড়দা বলিলেন, মুনি-ঋষিদের······

যতীনবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, দৃষ্টি তাঁদের ছিল, কিন্তু একচোখো হরিণের মত।

বড়দা আবার বলিতে চেষ্টা করিলেন, কায়েতের ঘরে···

যতীনবাবু কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, কপাল গুণে যখন জন্ম নিয়েছ তখন এই মানুষের দণ্ডকে মানতে হবে বৈ কি ? যাক, দেরী করো না, অভাগা ছেলেগুলোর দিকে তাকালে···

আর শোনা গেল না, নীচে নামিয়া গেলেন, শেষের দিকে কণ্ঠস্বর এত ভারী শোনাইল যে, বড়দার চোখ দিয়া আপনা-আপনিই জল উপছাইয়া পড়িতে চাহিল।

বড়দা বলিয়া উঠিলেন, কি একটা পোকা চোখে গেলো দেখতো জিতু ?

মেজদা কাপড়ের খুঁট চোখা করিতে করিতে চোখ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, কই, না, কিছুই তো নেই।

বড়দা বলিলেন, তা' হলে উড়ে গেছে, ইস, এমনি জ্বালা করছে !

প্রতুল বলিল, ব্রাহ্মণের অশৌচ কদ্দিন, বড়দা ?

বড়দা বলিলেন, এগারো দিন।

প্রতুল বলিল, মাত্র ? আর আমাদের ত্রিশ দিন ?

বড়দা বলিলেন, তাঁরা যে ব্রাহ্মণ।

প্রতুল বলিল, শুধু এই জন্য ?

বড়দা হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, হ্যাঁরে।

কিন্তু প্রতুলের দিকে তখন আগুন ধরিয়া গেছে। হিংসায় বিদ্বেষে ঘৃণায় তখন তাহার নিজেকে কামড়াইয়া খাইতে ইচ্ছা যাইতেছে। এ কোন ধর্ম্ম, এ কোন জাতি যাহা কেবল জন্মের ঠিকুজি লইয়া রচিত হইয়াছে ? জন্মিয়াই ইহারা পরকে ঘৃণা করিবার, ছোট ভাবিবার অধিকার পাইয়াছে, আর কষ্ট লাঘবের সমস্ত পন্থাই কেবলমাত্র জন্মের দোহাই পাড়িয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ; অহঙ্কারের মাত্রাটা ইহাদের বাড়াবাড়িতে পৌঁছিয়াছে তো বটেই, সকল যুক্তি শুধু একটি শব্দে পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং তাহাই সকলে মুখস্থ করিতেছে। জগৎসমক্ষে তাহারা বড়, আর সবাই ইতর, ইহা প্রচারের জন্যই যেন ইহারা নামাবলী গায় দেয়, পূজা করে, গাল বাজায়। কি গুণ ইহাদের আছে ? তাহাদের ক্লাশে যে ছেলে কয়েকটি ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হইয়া উঠিতেছে তাহারা ব্রাহ্মণই তো বটে।

ব্রাহ্মণ বটে কিন্তু সেও তো হইয়াছে; তাহাদের চাইতে সে বড় না হইতে পারে, ছোট কিসে? অন্ততঃ সমান তো বটেই। নিজেকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেও একটা পরাজয়ের গ্লানি প্রতুলকে মলিন করিয়া তুলিল।

প্রতুল বলিল, আমাদের পৈতে হয় না কেন, বড়দা?

বড়দা বলিলেন, হয়, অনেকে নিচ্ছেও, কিন্তু প্রায়ই কেউ নেয় না।

সেজদা বলিল, আমাদেরও একবার হবার কথা হয়েছিল, বাবা বলেছিলেন, না বড়দা?

বড়দা বলিলেন, হ্যাঁ।

প্রতুল বলিল, তবে নেয়া হল না কেন?

মেজদা বলিলেন, সে তোরা বুঝবি নে।

প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল, পৈতে নিলে আমরা ব্রাহ্মণ হতাম?

বড়দা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, তা কি হয়?

প্রতুল বলিয়াই চলিল, এগারো দিনে অশৌচ হত?

বড়দা থতমত খাইয়া গেলেন। মেজদা বলিলেন, হত বৈ কি?

বড়দা কিন্তু বলিলেন, না হতেও পারতো। সভার বক্তৃতায় ঐ নিয়ে বাকবিতণ্ডা লড়াই-ঠাণ্ডা হল, সাহস করলে না কেউ।

প্রতুল ভাবিতে লাগিল: ইহার অনেকখানিই আছে যাহা সে নাকি বুঝিবে না, অন্ততঃ মেজদা তাই বলেন। তাহার একটা আবছামত ঘটনা মনে পড়ে বটে। ঐ সেই বাড়ীটায় একটা হৈ চৈ ব্যাপার, খাওয়া দাওয়া, বাবা ছিলেন তার তদারকে, অশ্বিনী মুহুরী তাহাকে রসগোল্লা খাওয়াইয়াছে; টাউন হলে একটা মিটিং, আর পানুর সেই: কিরে তোরা নাকি ব্রাহ্মণ হতে যাচ্ছিস?

প্রতুল সগর্ব্বে জবাব দিয়াছিল, নিশ্চয়ই।

পানু বলিয়াছিল, ইস!

তাহার পর আর পৈতার কথা উঠে নাই, প্রসঙ্গটা কোনক্রমে

পানুরা আবার তুলিয়া বসে এই ভয়েও সে তাহাদের যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিয়াছে। প্রতুল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, আমাদের চাইতে ছোট জাত আছে, বড়দা?

বড়দা এতক্ষণে একটা উৎসাহজনক কথা বলিতে পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেলেন। বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আছে বৈ কি? অনেক আছে।

প্রতুল বলিল, তাদের জল আমাদের খেতে নেই?

বড়দা বলিলেন, না।

প্রতুল আর প্রশ্ন করিল না; এই সামান্য প্রাপ্তি যদি আবার কোন এক প্রবল ধাক্কায় হারাইয়া যায়, সেই ভয়ে সে ইহাকে কোলে জড়াইয়া ধরিল যেন; আশঙ্কায় তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল, যদি ইহাও যায়; তাহার বাঁচিবার কি সম্বল তবে থাকে? তেমনি একটা আনন্দও তাহাকে সস্নেহে দোলা দিতে লাগিল।

বাড়ীতে ঢুকিতেই দেখা গেল, এই মাত্র দুইটি কুলি প্রচুর খাদ্যদ্রব্যসম্ভার উঠানে নামাইয়াছে; সঙ্গে একটি ছেলে। ছেলেটিকে দেখিয়া বড়দা বলিলেন, কি রে নন্তু?

নন্তু বলিল, বাবা পাঠিয়ে দিলেন।

বড়দা বলিলেন, বেশ, বেশ তোর বাবাকে আশীর্ব্বাদ করতে বলিস।

মেজদা বলিলেন, হেমবাবু না? ভদ্রলোক বাস্তবিক…

নন্তু বলিল, আমি চলি?

বড়দা বলিলেন, এসো ভাই এসো, বাবাকে বোলো খুসী হয়েছি।

অপরিচিত কোন এক হেমবাবুর প্রতি শ্রদ্ধায় প্রতুলের মাথা নুইয়া আসিল। যিনি পাঠাইয়াছেন তিনি জানেন, জিনিসের অভাব ইহাদের নাই, তবুও তো পাঠাইলেন, বাবার সহিত পরিচয় ছিল বলিয়া? হয়তো তাহাই। সবটা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়াও

একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দে তাহার হৃদয় মন আপ্লুত হইয়া উঠিল; যেন কাহারও বিরুদ্ধে আর নালিশ নাই। সবাইকে ভালোবাসিতে পারিলে সে বাঁচিয়া যায়।

তাহার পর একদিন শ্রাদ্ধও হইয়া গেল।

মাথা ন্যাড়া করিয়া পাড়ওয়ালা কাপড় পরিতে তাহার ভারী ভাল লাগিল। একটা পরিবর্ত্তন, একটা নতুনত্ব। প্রতুল সেজদার ন্যাড়া মাথায় হাত বুলাইয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠে। সেজদা ছুটিয়া ধরিতে যাইতে যাইতে বলে, রোস। ধরা পড়িলে সেজদাও একবার মাথাটা ঘষে, একটু তালও বাজায়; প্রতুল সুড়সুড়িতে বঁ্যাকা হইয়া যায়। দেখাদেখি আর ছোট তিনটিও সেই রকম করে।

বড়দা বলিলেন, প্রতুল তুই এই গেটটার কাছে দাঁড়া। অশ্বিনী বাবু থাকবেন, ওঁর হাত থেকে নিয়ে যখন ব্রাহ্মণরা খেয়ে যেতে লাগবেন, তখন বড়দের চার আনা আর ছোটদের দু আনা করে দিবি।

প্রতুল বলিল, কেন?

বড়দা বলিলেন, তাঁরা যে ব্রাহ্মণ, তাঁদের দিতে হয়।

প্রতুল বলিল, আর কাউকে না?

বড়দা বলিলেন, আর তো কেউ এখন খাচ্ছে না। ওঁদের খাওয়ার ন্যাঠা না চুকতে আর তো কেউ খেতে পারে না। তুই থাক। বলিয়া চলিয়া গেলেন। প্রভাতের সমস্ত আনন্দ, নতুনত্ব, এক মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। তাহার পর অশ্বিনী মুহুরী যখন দুআনি সিকি তাহার হাতে গুঁজিয়া দিতে লাগিলেন, প্রতিবারই তাহার মনে হইল, হাতের মুঠাটা এই অভিজাত ভিক্ষুকদের মুখে ছুঁড়িয়া মারে। তারপর এক সময় বিকলাঙ্গের মত অনেকটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় যেমন ভাবে নির্দ্দেশিত হইতে লাগিল, সেই ভাবেই কাজ করিতে লাগিল, হুঁস হইল তখন যখন অশ্বিনী মুহুরী বলিলেন, নাও হল। আচম্বিতে

আবার তাহার ব্যথা-বোধটা জাগিয়া উঠিল। সদর রাস্তায় একদল মেথর ভীষণ গোলমাল শুরু করিয়া দিয়াছে; ভদ্রমণ্ডলীর ভুক্তাংশ কলাপাতা-সহ নর্দ্দমায় আসিয়া পড়িলে উহাদের মানুষ-সন্তানগুলি পশু-কুকুর ঠেলিয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে। ইহারা ছোট জাত, অস্পৃশ্য মেথর, ময়লা টানে, ইহাই তাহাদের অস্পৃশ্য হইবার কারণ; জন্মটা তো বটেই; অথচ ইহার বেশী ইহারা দাবী করে না; কুকুরকেও ইহারা ছোট মনে করিতে পারে না এমন পর্য্যায়ে ইহারা পৌঁছিয়াছে; যে ময়লা তাহারা ঘৃণায় ছাড়িয়া যায় তাহাই ইহারা…

এই তোরা সব লাইন দিয়ে বসে যা, বলিতে বলিতে অশ্বিনীবাবু দুই ভাঁড় দই লইয়া আসিলেন; সঙ্গে আসিল চিঁড়া চিনি ইত্যাদি। মেথরেরা কোলাহল করিয়া বসিয়া গেল; আশে পাশে কয়েকটা কুকুর জিভ বাহির করিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল, মেথরদের ভ্রূক্ষেপ নাই; পথ দিয়া লোক চলাচল হইতেছে, লজ্জা নাই; পথ-চলার ধূলাবালি উড়িতেছে, ঘৃণা নাই; একে অপরকে গালাগাল দিতেছে, বিচার নাই। একজন দহি দিতে লাগিল, আর একজন চিনি, ইহাদের জন্য ইহাই ব্যবস্থা—ইহারা ছোট জাত যে! ভালো খাওয়ার ইহারা কি জানে? যে চিনি দিতেছিল, তাহার কাছে আগাইয়া প্রতুল বলিল, আমি দেব চিনি।

পরিবেশনকারী বলিল, আচ্ছা তুমিও দাও, আমিও দি।

তাহাই হইল।

মেথরেরা যাহা খাইতে পারিল না, ভবিষ্যতের জন্য ভিজাদই সহ তাহা নোংরা কাপড়ে বাঁধিয়া লইল। ইহারা আশীর্ব্বাদও করিল না, দক্ষিণাও পাইল না; যে পায়ের ধূলা ইহারা বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহা পথেই থাকিল অথবা আবার লইয়া ফিরিল। ইহারা মৌখিক ভদ্রতা পর্য্যন্ত জানে না; ইহারা অভদ্র; না পাইলে কোন্দল করে, পছন্দ মত চিনি না হইলে চাহিয়া লয়—বাড়ীতে ফিরিয়া এক প্রস্থ নিন্দা ইহারা করিতে শিখে নাই। ঝগড়া ইহারা করে, শ্লীলতার

প্রলেপ দিয়া নহে, স্পষ্ট অসংলগ্ন অনর্গল অশ্রাব্য অকুণ্ঠ ভাষায়; ইহারা নোংরা কিন্তু নোংরামির সবটুকুই প্রকাশ্য, গোপন কিছু নহে।

সমস্তটা মিলিয়া প্রতুলের নিজেকে ভারাক্রান্ত বোধ হইতে লাগিল। কতক্ষণ যে এইভাবে কাটিল কে জানে? কে একজন কি একটা পুঁথি পাঠ করিতেছিলেন বহুক্ষণ হইতে, এখনও নাকি শেষ হয় নাই, তাহারই একটি আধটি অবোধ্য-শব্দ কানে আসিতেছিল; কিন্তু কোথাও এক মুহূর্ত্তের জন্য মনকে নিহিত করিয়া রাখা প্রতুলের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বাহিরে একটা ডালিম গাছ ছিল। ফল প্রচুর হইলেও একটাও টিঁকিত না; কুঁড়ি অবস্থাতেই পোকা ধরিত, একটা মার্ব্বেলের সমান হইতে না হইতেই পোকা ফুটা করিয়া বাহির হইত। বহু যত্নে যেটিকে হয়তো ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইত, সেটি কোনো-প্রকারে পুষ্ট হইতে পারিত। বেদানার মত লাল নহে, অত মিষ্টিও নহে; পোকা ইহাকে আরও বিকৃত করিয়া তোলে।

আমগাছটা কত বড়; দুইটা আমগাছ একই সঙ্গে জড়াইয়া গেছে। একটাতে প্রায়ই আম ধরে না। যেটায় ধরে, সেটার একটা আমও পোকা ছাড়া পাওয়া যায় না। আশ্চর্য্য, চালানী আমে তো একটা পোকাও থাকে না, আশ্চর্য্য সেদেশ—পোকা ছাড়া আমের দেশ—আর তেমনি মিষ্টি, কামড়াইয়া পেছনটা ফুটা করিয়া চুষিলেই হইল, আঁশ নাই। কিন্তু বড়দা বলেন, বড় দাম।

ইঃ, ঐ কুকুরটার সমস্ত শরীরে কী ঘা!—একেবারে লোম নাই, কোঁচকানো চামড়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, মাছির জ্বালায় হাঁটিতে পারে না, পাগল হইয়া উঠিয়াছে; সমস্ত দাঁত বাহির হইয়া পড়িয়াছে।...

কোথা হইতে ডাক আসিল: পুতু!—পুতু!

বড়দার ডাক।

সে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেই, যিনি ডাকিতে আসিতে-

ছিলেন, তিনি প্রতুলের মুখোমুখি হইতেই বলিলেন, আয় শিগগির, পাঠ হয়ে গেল, এতক্ষণে, এবার……

বাকীটা শোনা গেল না, কিন্তু দেখা গেল। বড়দা মেজদা সহ একদল নরনারী, যিনি পাঠ করিতেছিলেন একে একে তাঁহারই পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইলেন। নির্লজ্জ অসভ্য ব্রাহ্মণ ধৃষ্টতার সীমা ডিঙাইয়া পা দুইটাকে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে; মৃত পুঁথি পাশে পড়িয়া আছে।

আবার প্রতুলের ডাক পড়িল।

কিন্তু এবার প্রত্যুত্তরে বাহিরের দিকের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

পাড়ার তরুণ ও কিশোরেরা মিলিয়া পরমোৎসাহে স্থির করিয়া ফেলিল, তাহাদের পাঠোপযোগী একটি লাইব্রেরী করিতে হইবে। ইহাতে যে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে তাহা কাহারও মনে হইল না। কেবল একবার একটা কথা উঠিয়াছিল, সেটা বিরুদ্ধতায় যতখানি না লাগিয়াছিল, সমর্থনের জন্য কাজে লাগিয়া গেল তাহার চাইতে বেশী। কথা উঠিয়াছিল, পাড়ায় বড় একটা লইব্রেরী তো আছেই। তৎক্ষণাৎ জবাব আসিয়াছিল, উহা বড়দের এবং তাহাতে নভেলই একগাদা। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেরূপ হয়, এই ক্ষেত্রেও সুনীতির উপর অত্যধিক দৃষ্টি-সম্পন্ন কয়েকজন কৌপীন-আঁটা জুটিয়াছিলেন, যাঁহারা এই কঠোরতাকেই যেন একমাত্র শ্রেয় প্রেয় বলিয়া জানিয়াছেন; কাজেই ঠিক হইয়াছিল, নভেল বলিয়া কোন অশ্লীল

পুস্তক ইহাতে স্থান পাইবে না, যাহা থাকিবে তাহা একদল লৌহের মত দৃঢ় ব্রহ্মচারী গড়িবার মত ততোধিক সুকঠোর হাতুড়ি; অধিক পরিমাণে "ব্রহ্মচর্য পালন" "নার্সিং শিক্ষা" "জীবনী" ইত্যাদি থাকিবে; চাই কি, এই নির্ভেজাল মনের কসরতের সঙ্গে সঙ্গে একজোড়া মুগুর, একজোড়া ডাম্বেল ও বাঁশের একজোড়া প্যারালেল-বার থাকিবে—সমতালে শারীরিক পুষ্টিবৃদ্ধির জন্য। অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের নজর থাকিবে যে, কেহ কোথাও দুর্নীতিপূর্ণ পুস্তকাদি আত্মসাৎ না করিতে পারে, দীনেন রায় প্রমুখ ডিটেকটিভ উপন্যাসের খবর যেন কেহ ঘুণাক্ষরেও না জানে। বাস্তবিক এই দুঃসাধ্য সৎকর্ম্মের জন্য যাহাদের পোষাক ও ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ব্যবস্থা করা হইল, তাহাদের ইহাতে একদিকে যেমন গৌরব বৃদ্ধি পাইল, অন্য-দিকে পরের চরিত্র সংশোধনের জন্য ইহারা তেমনি চিন্তাকুল হইয়া পড়িল; যে কাঠিন্যের মধ্যে তাহারা আগে হইতেই নিরুদ্ধ ছিল, এখন তাহা আরও সুশৃঙ্খলিত ও সুনির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য পড়িবার ঘরে রুটিন টাঙাইয়া লইল। লুকাইয়া থিয়েটার করা বা পাকা কাঁঠাল নামাইয়া বা সেন বাগানের পেয়ারা—যেগুলির ভিতরটা লাল রংঙের—চুরি বন্ধ হইয়া গেল; শা—বা নিদেন বে—জাতীয় কোন প্রকার গালাগালের আদ্যক্ষর বাহির হইতে দেওয়া হইল না, সেগুলি প্রহরীদের কণ্ঠে জমিয়া নীল হইতে লাগিল। ব্রাহ্ম-বোর্ডিং-এর ঐ যে কাঁচা-মিঠা আম তাহা খাওয়া বন্ধ হইয়া গেল—রক্ষকের চিন্তাকুল রেখাপূর্ণললাট আবার মসৃণ হইতে লাগিল।

সংযম-শিক্ষার হাতেখাড়রূপে ঠিক হইল, ঘর যেমন নিজেদের তুলিতে হইবে, সস্তায় বাঁশ কিনিবার জন্য নিজেদেরই নদীর ওপারে যাইতে হইবে এবং কাঁধে করিয়া এই এতটা পথ আনিতে হইবে। কাহারও আপত্তি করিবার জো ছিলনা। নদী পার হইয়া এক বাঁশ-ঝাড়-সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ী উঠিয়া সব ঠিক করা হইল। প্রথম বাঁশে দায়ের এক কোপ পড়িয়াছে-কি কোথা হইতে "কোন শা"—ইত্যাদি

সুনীতি-বিগর্হিত অথচ বক্তার পক্ষে তৃপ্তিকর বচন, ছুর্নীতি-বিতাড়নে বদ্ধপরিকর চাঁইদের ও তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী শিষ্যদের কানে শিশা ঢালিয়া সজোরে জিহ্বা বাহির করিয়া দিল, কিন্তু পাছে জিহ্বা এই সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু পায় এই জন্য মাঝপথেই তাহাকে দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিতে হইল। সেই আর্ত্তনাদকারীও যেমন আগাইতেছিল, ইহারাও তেমনি বাঁশ ছাড়িয়া সেই ঝাড়-বাড়ীর অভিমুখে যাইতে লাগিল। সহসা একদল ভদ্রলোকের ছেলের মুখোমুখি হইয়া পড়ায় তাহার চীৎকার কমিল বটে, কিন্তু এই অহেতুক গালি দিবার কৈফিয়ৎ অনিল তৎক্ষণাৎ দাবী করিল।

লোকটি বলিল, না বলিয়া বাঁশ কাটেন ক্যানে ?

বলিল, পোছেন ক্যানে তোমার ভাইয়োক, মোরা কইছোঁ কি না কইছোঁ। না জানিয়া তোমরার এমন অকথ্য কথা বলিবার ধইচচ্যান, তোমরায় ভারী বয়া বাহে।

লোকটি বলিল, কী বয়া ? কী কন তোমরার ঘর ?

অনিল বলিল, ডাকো ক্যানে সেই লোকটাক, ভাই না কি হয়।

বাস্তবিক মজা এই, পূর্ব্বেকার হুকুমদারটির তখন পাত্তা নাই, ঘরে বা কোথাও অন্তর্ধ্যান করিয়াছে। অথচ এই লোকটিও তাহাকে ডাকিতেছে না। এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিল এক বৃদ্ধা ; সে-ই পলায়িত পুরুষটিকে ঘর হইতে বাহির করিতে গিয়া এখনকার আর্ত্তনাদকারীকে জানাইয়াছিল, এইরূপ একটা চুক্তি আগে হইয়াছিল, "ভদ্দর লোকের" ছাইলাদের এমন বলা উচিত হইতেছে না। সেই ভীরু ব্যক্তিটি স্বয়ং যখন স্বীকার করিল, তখন এই বড় কর্ত্তাটি বলিল, কিন্তু ঐ দরে মুই বাঁশ ব্যাচমো না।

অমিত বলিল, ক্যানে !

লোকটি অতি সংক্ষেপে বলিল, না।

তাহার পর আবার দর হইল এবং কষাকষিতে লোকটিরই জিৎ হইল। টাকায় একটি বাঁশ কমিল।

নন্দ বলিল, এই যাশু, মোটা মোটা দেখে কাটিস।

যীশু বলিল, ওকে যে আবার দেখাতে হবে। বে—

অনিল বলিল, এই—

সকলেই সচকিত হইয়া থামিয়া গেল।

বাঁশ নদীর ওপারের ঘাট পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া গেল। এখন নদী পার? একসঙ্গে জড় করিয়া বাঁধা হইল, কিন্তু ঘাটিয়াল লইতে রাজী হইল না; উপরন্তু বাঁশ পার হওয়া বাবদ কিছু দাবী করিল। আবার একটা কোলাহল হইল, অনিল ও যীশু বাঁশ ভাসাইয়া দিয়া সাঁতার দিল, আর, অন্যান্য সকলে নৌকা দিয়া এপারে আসিল। হট্টগোলের মধ্যে বাঁশ তাহাদের স্নানের ঘাটে আসিয়া ঠেকিল।

তেমনি করিয়া খড় আসিল। ধারা কেনা হইল। গর্ত্ত করিয়া খুঁটি পোঁতা হইল। কাজ অনেকটা অগ্রসর হইলে ঠিক হইল অন্ততঃ চাল ছাইতে একজন কামলা নিযুক্ত করাই নিরাপদ। শমন বলিয়া একজন হিন্দুস্থানী বিহারী ছিল পাড়ায়। সে রাজী হইল। চাল ছাইতে ছাইতে প্রত্যহই মুখের নানাপ্রকার ভঙ্গী করিয়া বলিয়া যাইত কি করিয়া 'টুই' বাঁধিতে হইবে। মুখভঙ্গীটা উহার মুদ্রাদোষ। হইলে কি হয়, প্রতুল উহারা হাসিয়া কুটিপাটি হইত এবং কেমন করিয়া 'টুই' বাঁধিতে হইবে তাহার নকল করিত।

উৎসাহের তোড়ে বাড়ীর কৃত্তিবাস রামায়ণখানা পর্য্যন্ত প্রতুল ও সেজদা বাড়ীর বাহির করিয়া আনিল, একবার ভাবিলও না এই জোয়ারের জোর যখন কমিবে এবং ভাঁটির টান যখন পড়িবে, তখন কোথাকার বস্তু কোথায় গিয়া উঠিবে, তাহার হদিস মিলিবে না। কিন্তু আজ তো সে চিন্তা নাই। তাই বাড়ীর পুস্তকসম্ভার যেমন কমিতে লাগিল, ওদিকে লাইব্রেরী তেমনি পরিপূরিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

হাতের লেখা ভাল বলিয়া লাইব্রেরীর হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা নকলের ভার প্রতুলের উপর পড়িল। একদিকে লাইব্রেরীর

বই পড়া, অন্যদিকে নকলের দ্বিগুণ চাপে প্রতুলের পাঠ্য পুস্তক-গৌণও হইল, বিস্বাদও ঠেকিতে লাগিল। বড়দা মেজদা সংযত করিতে চাহিলেন, কিন্তু মেজদা আজকাল আর বড় এখানে থাকেন না, আর বড়দার দিক হইতেও তাগাদা ছিল না, যেটুকু ছিল তাহাতে কাতরতাই বেশী ছিল, জোরজবরদস্তি ছিল না। প্রতুলের পুস্তক-পাঠ তেমনিই চলিতে লাগিল। এই কয়দিন মেজদা আসায় বাহিরের চাপটা কমাইয়া দিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু মন আছে সেইখানেই। স্কুলের পাঠ এমনি করিয়াই তাহার ক্ষয়িত হইতে লাগিল।

তেমনই একদিন বিকালবেলা প্রতুল লাইব্রেরী হইতে একখানা বই লইয়া বাহিরবাড়ীর বৈঠকখানা হইয়া অন্দরের উঠানে যাইতেই থমকিয়া দাঁড়াইল। উঠানে কাপড় শুখাইবার জন্য একটা মোটা তার আড়াআড়িভাবে টানা দেওয়া ছিল। তাহাকে সোজা করিয়া রাখিবার জন্য মাঝে ছিল একটা বাঁশ। সেই বাঁশটা ধরিয়া পূবমুখী হইয়া মেজদা হাসিতেছেন, আর পূব-ঘরে মেজ বধূমাতা কি একটা কাজ করিতেছেন। ব্যাপারটা কিছুই নয়, কিন্তু প্রতুলের নিকট ইহা অসামান্য মনে হইল। তাঁহাদের ইহার পূর্ব্বে দিনের আলোকে আলাপ করিতে সে দেখে নাই, তাই এই গোপনতাটুকু বিসদৃশ বলিয়াই ঠেকিল, অথবা, হয়তো অন্য কোন কারণে, যে-কারণ কিশোর-মনে অর্দ্ধসুপ্ত থাকিয়া যায়, যাহা আদি, যাহা মূল, যাহা হয়তো পৌরুষ-হিংসা! প্রতুল উভয়ের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল; ইতিমধ্যে বধূমাতা সামলাইয়া লইয়াছিলেন এবং মেজদাও যেন ঈষৎ অপ্রস্তুত হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। অন্তত প্রতুলের সেই ধারণা হইল। ইহার পরে সে যে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার অতিরিক্ত গম্ভীর মুখ দেখিয়া বুদ্ধিমতী বধূমাতা নিমেষেই সবটা বুঝিয়া লইলেন, অথচ ব্যাপারটা সামান্য হইয়াও এমনই লজ্জা ও সংস্কারে জড়িত যে, তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত করা চলে না। এই চির-অভিমানী

ও অদ্ভুত ছেলেটার ছোটখাটো নালিশ কি করিয়া যে মিটাইবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। শিক্ষিতা বধূমাতা মুখে সলাজ হাসি ও ভেজাগামছাটা হাতে লইয়া ডাকিলেন, ঠাকুরপো!

প্রতুলের গাম্ভীর্য শতগুণ বাড়িয়া গেল। সে অবজ্ঞায় চলিয়া যায় দেখিয়া বধূমাতা সস্নেহে হাত ধরিয়া বলিলেন, হাত পা মুছিয়ে দি।

প্রতুল সবেগে নিজেকে ছাড়াইয়া বলিল, লাগবে না।

বধূমাতা এই অহেতুক জেদী ছেলেকে জানিতেন; ইহার নিত্য নতুন আবদার তাঁহাকে সহিতে হইত। খাওয়াইয়া, আঁচাইয়া মুছাইয়া কোনো প্রকারেই ইহার পরিতুষ্টির সীমার নাগাল পাইতেন না। মেজদার কাছে মার খাইয়া সকল নিষ্ফল ক্রোধ প্রতুল এই নির্ব্বাক বৌদির উপরই ঝাড়িত; বৌদির সহিষ্ণুতার অবধি ছিল না। কতবার রাগ করিয়া কথা বলিত না, বৌদি উপযাচিকা হইয়া ঘাট মানিতেন। প্রতুলের তাহাতে উৎসাহ বাড়িত বৈ কমিত না। কথা না বলিয়া শাস্তি দেওয়ায় প্রতুল একটা অস্বাভাবিক আনন্দ বোধ করিত। বিমলার কঠিন বাক্যালাপ সমর্থন করিতে সে অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিত। সেজদাও এই প্রভাব প্রতিপত্তির হাত যেন এড়াইতে পারিত না, অথবা প্রতুলের কিছু পরিমাণ স্বভাবও হয়তো সে পাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে জ্বালা ছিল না। সর্ব্বাগ্রে যে সুউচ্চ কণ্ঠ বাড়ীর সকলকে চকিত ও লজ্জিত করিত যাহা অনিবার্য্যক্রমে প্রতুলের। তাহাতে মমতার লেশমাত্র থাকিত না, লজ্জার চিহ্নও খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। অত অধিক বয়স পর্য্যন্ত যে একটা লজ্জাকর শিশুরোগ তাহাকে ছাড়িতেছে না, সেজন্য নিন্দা শুনিয়া শুনিয়া সেগুলি এখন সুসহ হইয়া গিয়াছে এবং যাঁহারা সে দুরারোগ্য রোগের ফলভোগ করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতাও বুঝি তাহার হইত না। এবারেও বধূমাতা অনেক সাধিলেন, কিন্তু প্রতুল নিজের অবিচলতায় গর্বেবোধ

করিল এবং ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া এমনই কথা বন্ধ করিল যে, মেজদা একদিন সেজদাসহ প্রতুলকে লইয়া তাহাদের বর্ত্তমান রাগের হেতু জানিতে চাহিলেন। লজ্জা অপরাধ যেন ইঁহাদের, আপোষ মীমাংসা যেন ইঁহাদেরই গরজ। সেজদা কিছুই বলে না, যত জবাব প্রতুলই দেয়, কেননা, বিমলার সংস্পর্শে থাকিয়া তাহার ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে, উচিত কথা বলিতে সে কোনক্রমেই পশ্চাৎপদ নহে। অর্থহীন প্রলাপ বকিয়া গেল। মেজদা এই প্রগলভের প্রত্যুত্তরে হাসিলেন এবং মিটমাটের জন্য বলিলেন। মীমাংসা হইল বটে কিন্তু প্রতুল নিজেকে জয়ী মনে করিল। তাহার উদ্ধত গর্ব্বিত আচরণ সকলকে তিক্ত বিরক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। এমন করিয়া করিয়া সহ্যের সীমা যখন পার হইয়া গেছে, তখন জোড়াতালির কথা মেজদাও পুনঃ পুনঃ তুলিতে বিরক্ত বোধ করিলেন, স্ত্রীকে প্রতিবার দোষী সাব্যস্ত করিতে বাধিল। তাহাতে ফল এই হইল যে, বিশেষ কারণে প্রতুল অকুণ্ঠচিত্তে বিমলার আঁচলে নিজেকে সংলগ্ন করিয়া রাখিল। মেজাজের এই অসংলগ্নতা বহু প্রকারে তালকানা হইয়া ঘুরিতে লাগিল। তারপর ইহাই একদিন অকস্মাৎ এক জায়গায় ঘা খাইয়া একটা অদ্ভুত পথে প্রধাবিত হইল।

ভোরবেলায় একদিন তাহাদের একটা পোষা খাসী, বাড়ীর পাশের যে পোড়ো-বাড়ীটা ক্ষুদ্রাকার মাঠে-পরিণত হইয়াছে সেখানে কাটিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কাটিবে কসাই। মুসলমান কসাই খাসীটাকে একাই গলার উপর একটি পা দিয়া চাপিয়া ধরিল এবং তেমনই অবস্থায় গলার খানিকটা কাটিয়া ছাড়িয়া দিল। সে কী যতনা! কসাই নির্ব্বিকার চিত্তে সেটিকে আমগাছে ঝুলাইয়া দিয়া ছাল ছাড়াইতে লাগিল; খাসীটার ডাকিবার উপায় ছিল না, কিন্তু বহুক্ষণব্যাপী তাহার সর্ব্বশরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকিল।

প্রতুল সেখানে ছিল।

যে মাংস ডিসের আকারে আসিলে সে অনায়াসেই খাইতে

পারিত, প্রশ্নও করিত না, তাহাই সম্মুখে ঐভাবে কাটিতে দেখিয়া এই নিষ্ঠুরতা অন্তস্থলে গিয়া শূলের মত বিঁধিল। সোজা বাড়ীতে আসিয়া প্রচার করিয়া দিল যে, সে মাংস খাইবে না। যে-মাংসের প্রতি তাহার লোভের অন্ত ছিল না, তাহারই প্রতি এই প্রকার বিরাগ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল, কিন্তু প্রথমটায় ইহাকে অন্যতম ছেলেমানুষি মনে করিয়া আমলে আনিল না।

সকলেই জিজ্ঞাসা করিল, কেন কেন?

প্রতুল সংক্ষেপে বলিল, না।

মেজদা বলিলেন, তার তো একটা কারণ আছে, না, নেই?

প্রতুল চুপ করিয়া রহিল।

মেজদা বলিলেন. কি?

প্রতুল বলিল, আমি খাব না।

মেজদা একটু উষ্ণ হইয়া বলিলেন, কেন খাবিনে তা বল, বলবিনে? খাবনা বললেই অমনি হল?

প্রতুল তাহার উত্তরে বলিল, আমি মাছ মাংস ডিম কিছু খাবো না। নিরিমিষ খাবো।

বিমলা বলিল, বৈরাগী হবি?

অনেকেই হাসিয়া উঠিল।

প্রতুল হঠাৎ বলিয়া বসিল, ও জীবহত্যা।

মেজদা বলিলেন, ও-সব ফাজলামো ছাড়, তোর জন্য কিছু ভিন্ন রান্না হোতে পারবে না। বলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

বিমলা বলিল, শুনলি তো?

প্রতুল বলিল, বেশ আমি যেন কিছু চাইছি।

বিমলা বলিল, আহা কী নির্লোভীরে! দুদিন বাদেই মুখ থেকে নাল গড়াতে সুরু করবে'খন। যত ঝঞ্চাটি ছেলে বাবা।

অনেক সাধাসাধি অনুরোধ উপরোধ হইল। খাইবার সময় প্রতুল সত্যি সত্যিই মাংস না খাইয়াই উঠিল। কিন্তু খাওয়াটা

এমন বিস্বাদ ঠেকিল যে, কথা রক্ষার গৌরব দিয়া তাহাকে ঢাকিতে হইল মাত্র। মানসিক দুর্ব্বলতার সেই প্রলেপিত মুহূর্ত্তে বড়দা বলিলেন, পুতু, আমার একটা কথা রাখবি?

প্রতুল মুখ তুলিল।

বড়দা বলিলেন, মাংসটা না-হয় না-খেলি, খেতে যখন চাসনা, থাকগে, কিন্তু এক কাজ কর না কেন, ডিমটাও না-হয় না-ই খেলি, মাছটা, সব ছেড়ে কেবল মাছটা খা, আচ্ছা?

মাংসটা প্রতিনিয়ত হয় না, ডিমটাও প্রত্যহের খাদ্য নহে, এক মাত্র মাছটাই একেবারে দৈনন্দিন খাদ্য। একই সঙ্গে বসিয়া খাওয়া, সকলেই খাইবে অথচ কেবল সে-ই খাইবে না, ভাবিতেও বড়দার পীড়া বোধ হইল। মেজদাও এই আপোষ প্রস্তাবে খুসী হইলেন। কারণ, একমাত্র ঐ ঝগড়াটে ছেলেটা না খাওয়ায় সকলের কাছেই মাংসটা কিছু কম স্বাদু মনে হইয়াছিল।

মেজদা বলিলেন, বেশ তো তাই কর না।

প্রতুল জবাব দিলনা।

সকলেই জবাবের প্রত্যাশায় উন্মুখ হইয়া রহিল। কিন্তু সে তেমনি মুখ ফিরাইয়া রহিল।

মেজদা বলিলেন, কি বলিস?

প্রতুল মুখ ফিরাইয়াই বলিল, না।

বিমলা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, খাবার জন্য কেন এত মাথা কোটাকুটি, আমি ভেবে পাইনে। এ ন্যাকামি ক'দ্দিন?

ঠিকই। পরদিন কিছুক্ষণ সাধাসাধি হইল বটে, কিন্তু প্রতুল শেষাশেষি মাছ খাইয়াই উঠিল।

সেজদা এক সময়ে বলিল, বারে, বৈরাগী!

প্রতুল লজ্জিত হইল; কিন্তু বলিল, বেশ। মাংস খাব না দেখে নিস।

ক্ষতি-পূরণ হিসাবে তাহার ধর্ম্মপথের অন্যান্য আচার বহুল

পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোথা হইতে একখানা "ভাবোন্মত্ত" নামীয় পট জোগাড় করিল। কি মনে করিয়া ভোর বেলায় স্নান করিতে লাগিল। ভোর বেলা অপবিত্র হইয়া উঠিবার প্রতিকার হিসাবে ইহা ভালই হইল। এই শুচিতার পর সেই পটখানি সম্মুখে রাখিয়া খানিকটা সিঁদুর আনিয়া প্রতিদিন তাহাতে ফোঁটা আঁকিতে লাগিল। মেজদার একখানা পরিত্যক্ত জগদ্বন্ধুর কাটা ছবি ছিল, তাহাও জোগাড় করিল। দুই একটা কাগজে ধর্ম্ম-কথা লিখিয়া দেয়ালের বেড়ায় টাঙ্গাইয়া দিল। বিবাহ করিবে না বলিয়া কেবল মুখেই প্রকাশ করিল না, পাছে এই প্রতিজ্ঞা হইতে কোনদিন কোনক্রমে চ্যুত হয়, এই জন্য দেয়ালে 'বিবাহ করিব না' লিখিয়া রাখিল, বিবাহের সম্ভাবনা তখন ছিলও না। পাড়ার 'হরি লুটে' সর্দ্দারি করিয়া ফিরিতে লাগিল এবং ভবিষ্যতে সে যে একজন মহা সাধু হইয়া উঠিবে ইহাতে অন্ততঃ তাহার নিজের আর সংশয় রহিল না। লাইব্রেরী হইতে নিগমানন্দের "ব্রহ্মচর্য্য" বইখানা লইয়া অতি আগ্রহে পড়িতে লাগিল। অনুষ্ঠানের দিক দিয়া যখন আর কোন দিকেই ত্রুটি থাকিল না, তখন একদিন পাড়ার কিশোর ও তরুণ মহলে একটা হাস্যকর কাণ্ড সকলের কৌতুকের কারণ হইল। লাইব্রেরীর নোটিশ বোর্ডে কে বা কাহারা লাইব্রেরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। কালুর স্বীকারোক্তিতে জানা গেল—সে প্রতুল॥

ঘটনা অনন্ত; সময় সীমাহীন। ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া মানুষ

ডুবে, উঠে—হঠাৎ একদিন তেমনি অকস্মাৎ একেবারেই অদৃশ্য হইয়া যায়। সে-ও একটা ঘটনা। কিন্তু মানুষ হিসাবে সে আর সাক্ষী থাকে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষও একটি ঘটনামাত্র। মানুষের জন্য বিশ্ব নহে। অসংখ্য অগুনতি ঘটনার মধ্যে সে একটি অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ নগণ্য ঘটনা, আর, একটি মানুষকে জড়াইয়া যাহা ঘটিয়া যায় তাহার পরিমাণ কতটুকু! অথচ, আমাদের পৃথিবীর এই ছোট রঙ্গমঞ্চে এই ঘটনাগুলিই এক একজনের জীবনের পক্ষে বিচিত্র; মত্ত অহঙ্কারে মানুষ মনে করে যে, এই উঠা-পড়ার আবর্ত বুঝি তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

প্রতুলও যদি ভাবে, তবে চিরাচরিত প্রথাকে বজায় রাখিবে মাত্র।

পাড়ার কয়েকটি ছেলে জোগাড় করিয়া সে একটি লাইব্রেরী করিতে চেষ্টা করিল। ক্ষুদ্রাকারে প্রথমোৎসাহে একটি হইল বটে, কিন্তু লোকাভাবে বেশীদূর অগ্রসর হইল না। নিকটেই আর একটি পাঠাগার অন্য একদলের উৎসাহের পরিচর্য্যায় গড়িয়া উঠিল, তাহাতেওসে যোগ দিতে চেষ্টা করিল, তেমন আমল পাইল না। পরিশেষে, নিজেদের বাড়ীতেই একটি ভাঙ্গাঘরে একটি লাইব্রেরীর প্রবর্ত্তন করিল; জিদ থাকিল, কিন্তু ইহা যে একেবারেই ঠুঁটো, তাহা মনে-মনে পরিষ্কার বুঝিয়া তাহাও এককালে গুটাইয়া লইল।

প্রতুলের এখন বেশ বয়স হইয়াছে; কৈশোর কাটিয়া যায় যায়; গলার স্বর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, গোঁফ ও দাড়িতে লাল-হলদে রংয়ের একপ্রকার কেশ দেখা দিতেছিল; সমস্ত শরীর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কি একপ্রকার হইয়া গিয়াছে। পাড়ার ছোট ছেলেদের কাছে সে নিজেকে বড় মনে না করিয়া পারিল না। পুতুদা।

সেজদা পূর্ব্বোক্ত লাইব্রেরীতে উত্তরোত্তর প্রিয় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া এবং সেই লাইব্রেরীর জন্য সে মঙ্গল কামনা করে দেখিয়া প্রতুলের আক্রোশ ও বিদ্বেষ সেজদার উপরেও পড়িল। স্বয়ং এক-

খানা হাতে-লেখা মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে লাগিল, পাঠকদের কাছে তাহাকে নিজে পৌঁছাইয়া দিতে হইত। তবুও তো একক থাকিবার পরাজয়কে গৌরব দিয়া প্রলেপ দেওয়া গেল ? সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য-পুস্তকের বাহিরের বই পড়ার দিকে যত ঝোঁক বাড়িতে লাগিল, স্কুলের পড়ার প্রতি ততই ঔদাসীন্য দেখা দিতে লাগিল। কাজেই এককালে যে সে য়ুনিভার্সিটির কিছু পড়াই বাদ দিবে না বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা ক্রমশঃই বিস্মৃতির ঘোলা জলে মিলাইয়া গেল। সংস্কৃত ও ইতিহাসের পাখা মেলিয়াই সে বিদ্যাসাগর পার হইবে এইটুকু সান্ত্বনা ছাড়া তাহার আর কিছু ছিল না। চলতি বিদ্যার্জ্জনের বিরুদ্ধে নালিশ কাগজে-কেতাবে পড়িয়া এই সাধারণ জ্ঞানার্জ্জনের পিপাসা তাহার কমিয়া গিয়াছিল। যখন যে জীবনী পড়ে, তখন তাঁহারই মত হইতে ইচ্ছা যায়। পরমহংস হইবে, না বিবেকানন্দ হইবে, মুকুন্দদাস হইবে, না যাত্রা গানে ঢুকিবে, কিছুই ঠাহর করিতে পারে না! লড়াইয়েও যাইতে চাহে, বঙ্কিমচন্দ্রও হইতে চাহে। ক্লাইভের মত দুর্দ্ধর্ষ চরিত্রও ভালো লাগে, আবার অক্ষয় মৈত্রেয়ের মত সিরাজদ্দৌল্যা লিখিতেও সাধ যায়। বায়োস্কোপ দেখিয়া বাড়ী ফিরিলে সে লাইনেই সে কি করিতে পারে, ভাবে। আবার, বিদ্যাসাগর বা রামমোহন বা আনন্দমোহন বসু কাহাকেও বাদ দিতে ইচ্ছা করে না। চিত্তের এই অস্থিরতা সহানুভূতির চক্ষে তলাইয়া বিশ্লেষণ করিবার মত অভিভাবক কেহই ছিলেন না; বাংলা দেশের অভিভাবকেরা ইহার ধারও ধারেন না; চিরকাল কর্তৃত্ব করিয়া ও কর্তৃত্ব সহিয়া বালকের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ইহাঁরা প্রথম হইতেই নিতান্ত "ছেলেমানুষি" বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া হাসির চোটে বা ধমকের দাপটে নিরস্ত করিয়া দেন। মর্ম্মান্তিক এই পীড়া বালকের মনে এতই দুঃসহ হয় যে, সংসারের আনন্দ অতি অল্প বয়সেই তিক্ত হইয়া যায়। এমনই একটা বিশৃঙ্খল মন লইয়া যাহারা মানুষ হয়,

তাহারা পৃথিবীতে সকল প্রকারেই পঙ্গু ও বিকৃত না হইয়া পারে না। ইহাদের মনে স্ফূর্ত্তি বিকশিত করিবার কোন উপায়ই নাই, বরং সেই স্ফুর্ত্তিকে সর্ব্বপ্রকারে চাপিয়া দলিয়া পিষিয়া অসুন্দর করিয়া তোলাই একমাত্র সুপন্থা বলিয়া অভিভাবকেরা জানিয়া আসিয়াছেন।

প্রতুল এমনই একটা দুর্ভেদ্য জালের ভিতর দিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। পিতৃমাতৃস্নেহ-বঞ্চিত বালকের মন বুঝিয়া চলিবার কেহই ছিল না।

গভীর রাতে, প্রায় সকলকে জাগাইয়া, পুবের ঘর হইতে পশ্চিম ঘরে নিদ্রিতা মা'কে ডাকিতেছিল, মা—মা, ও মা।

ঐ ঘরে কিন্তু সেজদা আছে। সে জাগিয়াও উত্তর দেয় না। প্রতুল উঠানে হঠাৎ কিছু একটা দেখিয়া ফেলে এই আতঙ্কে দরজাটা পর্য্যন্ত খুলিতেছে না। পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে, মা, পেচ্ছাপ ফিরব।

যেন ডাকাত পড়িয়াছে। অথচ এমনি রোজ-ই। বিমলারও অসম্ভব গভীর ঘুম। তাহাকে ঠেলিয়া না তুলিলে প্রায়ই তাহার ঘুম ভাঙ্গে না। এদিকেও চীৎকার বন্ধ হয় না। বড়দার উত্তর ঘর হইতে ক্ষীণ আওয়াজ আসিতে থাকে, কিরে, কেন?

প্রতুল বলে, পেচ্ছাপ ফিরব।

বড়দা বলেন, তা' বেরোস না কেন?

প্রতুল কাঁদ কাঁদ হইয়া বলে, কেউ দরজা খুলছে না যে? দাঁড়াবে কে?

বড়দা বলেন, আচ্ছা আয়, এই জানলা খুলছি।

উঁ, বলিয়া প্রতুল আপত্তি জানায়।

অগত্যা বড়দাকে উঠিতে হয়, দরজা খুলিয়া উঠানে আসিতে হয়, বলেন, কই বেরোলি নে?

তখন প্রতুল দরজা খুলিয়া বাহির হয় এবং রাগ করিয়া বলে, কতক্ষণ থেকে ডাকছি!

যেমন ভীতু হয়েছিস, বড়দা বলেন। প্রতুল ইহার জবাব দেয় না। উঠানের এক কোনে কোন মতে কার্য্য সমাধা করিয়া ঘরে আসে, খিল দেয়, তবে যে দাঁড়ায় তাহার ছুটি। নহিলে, একটু আগে পরে হইলেই, সেই গভীর রাতেই, অনর্থ বাঁধাইয়া বসে।

ততক্ষণে জাগ্রত সেজদা বলে, ভূত দেখলি?

প্রতুল অত্যন্ত রাগিয়া বলে, বেশ তো, তোর তাতে কি, তুই তো দাঁড়ালি নে।

সেজদা মুখ গুঁজিয়া হাসে।

প্রতুল রাগে ফুলিতে ফুলিতে কখন ঘুমাইয়া পড়ে!

ভোর বেলা মুখ ধুইয়া সবে পড়িবার ঘরে ঢুকিতে যাইতেই কানে গেল একটা আর্ত্তনাদ। ত্রস্তে বাহির হইয়া দেখে, হরিহরের কাকা হরিহরকে বেদম মারিতেছে। তাহার কাকাটি ছিলেন ভীষণ উগ্র প্রকৃতির; হরিহরের মা ছিলেন তেমনি শাসন-দক্ষা, কিন্তু আপন সন্তানদের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহবৎসলা; ফলে, আদরের পাহাড়ে চড়িয়া হরিহর কাকা খুড়া বলিয়া কোন বস্তুকে বড় একটা গ্রাহ্য করিত না; অন্ততঃ সে বিষয়ে মায়েরও কোন শাসন ছিল না। কিন্তু ইহার বেয়াদবি সহ্যের মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে হরিহরের কাকা এক একদিন মরিয়া হইয়া হরিহরকে এমন মার মারিতেন যে, তাহার পরে সে-বাড়ীতে মেছোহাটা বসিয়া যাইত। হরিহরের খুড়ী নিশ্চুপে লজ্জাবনত মুখে সকল বিষ-বাণই সহ্য করিতেন, ততোধিক নিশ্চুপ থাকিতেন হরিহরের বাবা স্বয়ং। কোন পক্ষেই ওকালতি বা কোন পক্ষের বিরুদ্ধেই রায় দিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইত। একদিকে ছোট ভাই, একেবারে অনাদরের নহে; অন্যদিকে স্বয়ং স্ত্রী—যিনি রূপ, অহঙ্কার ও দাদা মশাইয়ের তেজ দিয়া নিজেকে ঘিরিয়া রাখিয়া স্বামীকে হাতের মুঠায় রাখিতে জানিতেন।

মার আর থামে না। হরিহরের সেকি চীৎকার, মাগো, বাবাগো।

কিন্তু সকল জিনিসের যখন অবসান আছে, ইহারও অবসান হইল।

বড়দা বলিলেন, এই, তোদের পড়াশুনো নেই?

সুরুৎ করিয়া তাহারা পড়ার ঘরে চলিয়া আসে। চলিয়া আসে বটে, কিন্তু তখনই পড়া সুরু হয় না। প্রতুল বলে, কী মারটাই মারে ওর কাকা, য়্যাঁ?

সেজদা বলে, বেশ করে, যেমন বেয়াদব হরিহরটা। তোরই তো বন্ধু।

প্রতুল বলে, আহা, তাই বলে এমন গরু-পেটা করবে নাকি?

সেজদা বলে, করবেই তো।

প্রতুল বলিল, যাঃ, তোর সঙ্গে কথাই বলব না। বলিয়া রাগে ক্ষোভে নিজের বই টানিয়া লয়।

কিন্তু স্বভাবত সেজদার নিরীহ মুখখানা বাড়ীর বধূমাতাদের ভাল লাগিত। বহুদিন তাঁহারা প্রতুলের সমক্ষেই বলিতেন, সেজ'র মুখখানা ভারী কোমল। ফলে, এই উপসংহার সহজেই হইত যে, প্রতুলের মুখ রুক্ষ ও কঠোর। এবং তাহা সত্য। নারীর আকর্ষণের কোন উপকরণই প্রতুলের ছিল না, তদুপরি ঘৃণ্য সংকীর্ণতা স্বতঃই উৎসারিত হইত বলিয়া কেহই এই কথা না বলিয়া পারিত না। পরাজয়ের লজ্জায় প্রতুলের মুখ যেমন রাঙা হইয়া উঠিত, বুকের জ্বালাময়ী হিংসা তেমনি চোখে আসিয়া জ্বলিতে থাকিত। অথচ এই অভিমতের বিরুদ্ধে তাহার বলিবার কিছুই ছিল না। অপমানিতের মত নিজেকে গুটাইয়া লওয়া ছাড়া উপায় থাকিত না।

ইতিমধ্যে বড়দার পুনর্ব্বিবাহ হইয়া যাওয়ায় মেজ বধূমাতা মেজদার সহিত ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছিলেন। সংসারে আর একটি

বধূ আসিয়াছিলেন। সেটি বড়দার। গ্রাম্য মেয়ে; স্বাস্থ্য ভাল এবং সুশ্রী। বধূর আগমনে কি একটা উপলক্ষে খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কর্ম্মব্যস্ত বাড়ীতে অভিমানী প্রতুলের খোঁজ রাখা কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না, কেহ রাখেও নাই। রাত্রি বেশী হইতেছে মনে করিয়া প্রতুলের রাগ হইল; কাহাকেও কিছু না কহিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল; কিন্তু ঘুম আসিল না; পরন্তু দেরী হইতেছে দেখিয়া উত্তরোত্তর রাগ বাড়িতে লাগিল। ব্রীড়াবনতা নববধূ ঘরেই ছিলেন। এক সময় ঘরে আর কেহ ছিল না। অকস্মাৎ নববধূটি অনেক কষ্টে সঙ্কোচ কাটাইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া প্রতুলের মাথার কাছে দাঁড়াইলেন। প্রতুল তাঁহার আগমন টের পাইয়াছিল। কিন্তু একদিকে অভিমান, অন্যদিকে নতুন কাপড়, নতুন মানুষ ও নানাপ্রকার সুগন্ধের মৃদু আবহাওয়া তাহাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। ইহার পর একটা নতুনতর স্পর্শ তাহাকে সচেতন করিল, অত্যন্ত অস্পষ্ট মধুর একটা আহ্বান কানে আসিল। প্রতুলের ভাল লাগিল, খুবই ভাল লাগিল; ইহাকেই বারংবার উপভোগ করিবার জন্য সে না দিল জবাব, না ছাড়িল অভিমান। পাশেই একটা মিষ্টান্নের হাঁড়ি ছিল, তাহা হইতে একটি রসগোল্লা তুলিয়া তাহার নতুন বৌদি তাহার মুখের কাছে ধরিলেন। অত্যন্ত আগ্রহে প্রতুলের দুই নিষেধসূচক হাত চাপিয়া ধরিয়া সহাস্যে মুখে গুঁজিয়া ধরিলেন। এবার প্রতুলও হাসিয়া খাইয়া ফেলিল। ইহার পর তাহাদের মধ্যে প্রগাঢ় 'বন্ধুত্ব' হইয়া গেল। পাড়ার অন্য দুই একটা ছেলের অনুকরণে সংগৃহীত কূল পেয়ারা কাচামিঠা আম বৌদির জন্য আনিত; বৌদিও ইহার অত্যাচার নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করিতেন। সন্ধ্যায় না খাইবার জিদ ধরিলে বৌদি আদর করিয়া সাধিয়া আনিয়া রান্নাঘরে পিঁড়িতে বসাইয়া দিতেন; প্রতুলের ইহাতে কৌতুক বোধ হইত।

স্কুল হইতে আসিয়াই প্রতুল বৌদির কাছে হাজিরা দিত।

হয়তো বৌদি শুইয়া আছেন। বৌদির পা দুইখানা হাতের তেলোতে মাপিয়া সহসা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিত, কী ছোট্ট আপনার পা দু'টো, এই এতটুকু। বলিয়া আবার মাপিত। রাত্রে শুইয়া পড়িয়া বলিত, বৌদি, মশারী? বৌদি সযত্নে চতুর্দ্দিকে মশারী গুঁজিয়া দিতেন।

এত যে ভালোবাসার বৌদি, তিনিও ঐ সমালোচনায় সায় দিতেন—সত্য বলিয়াই সায় দিতেন। নীরবে সহ্য করা ছাড়া বলিবার কিছু ছিল না। অন্তত এই বধূমাতাটিকে সন্তুষ্ট রাখিতে তাহার প্রয়াসের অবধি ছিল না। কিন্তু সেখানেও সেই এক সমালোচনাঃ প্রতুল রুক্ষ, প্রতুল অসুন্দর। ভিতরে অসহ্য দুঃখ ধূমায়িত হইত আর ভাবিত এ পৃথিবীতে তাহাকে ভালবাসিবার কেহ নাই। ভালবাসা তাহার লভ্য বস্তু নয়। মা আসিয়াই মারিতে সুরু করিয়াছেন। অন্য ছেলেদের মাকে দেখিয়া তাহার দস্তুর মত হিংসা হইয়াছে। মেজদা কথায় কথায় চড়-চাপড় তোলেন, বাবা খিটি-মিটি করিয়া গিয়াছেন; ছোড়দি টিপ ঢাপ হরদম কীল মারে, সেজদা তাহাকে স্পষ্টতঃ ভালবাসে না; বড়দার ঔদাসীন্যের অবধি নাই, বৌদিরা কেহই আন্তরিক ভালবাসেনা, একটু ঘৃণাই করেন বরং। পৃথিবীতে কোথাও যেন লেশমাত্র ভালবাসা তাহার জন্য নাই, কেহই তাহাকে গ্রাহ্য করে না, সকলেই তাহাকে দুয়োদুয়ো করে। এ সংসারে বাঁচিয়া লাভ কি? পরম দুঃখ এই যে, যাহারাই নাকি তাহাকে ভালোবাসিত অথবা ভালোবাসিতে পারিত, তাহারা কেহই বাঁচে নাই। তাহার আপন মা নাই, পিসিমা নাই, এমন কি অশ্বিনী-মুহুরী পর্য্যন্ত সেদিন মারা গেল। অতএব এই সুকঠোর কারাগারে কড়া নজরের শাসনে তাহাকে বি-রূপ থাকিয়া দিন কাটাইতে হইবে, উপায় নাই।

তাহার পর অকস্মাৎ একদিন যখন এই নতুন বৌদিটিরও একটি সন্তান আবির্ভূত হইল, তখন স্বভাবতঃই প্রতুলের আপন বলিয়া যেন

সব কিছুই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। প্রতুলের সেই পূর্ব্বেকার ঘনিষ্ঠতা একেবারে নিঃশেষে মুছিয়া যাইতে লাগিল। তখন আর প্রতুলকে হিংস্রতার পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার কেহ বা কোন উপায়ই থাকিল না।

সেইদিন স্কুলে যাইবার পথে বাহির হইয়া চোখে পড়িল, হরিহরদের বাড়ীর সম্মুখে দুইখানা ঘোড়ার-গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে; তাহাতে একটা সংসারের যাবতীয় বস্তু উঠানো হইতেছে। পাশেই হরিহরের খুড়তত ভাই নিত্য দাঁড়াইয়াছিল। প্রতুল তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, কিরে নিত্য চললি নাকি?

নিত্য মুখখানা তেমনি গম্ভীর করিয়া বলিল, হ্যাঁ, আমরা আর এ-বাড়ীতে থাকব না।

স্কুলের প্রথম পিরিয়াডেই হেডমাষ্টারের ঘরে একসঙ্গে বহু ছেলের ডাক পড়িল। ইংরাজী মাষ্টার গতকাল অনেকের পকেটে নস্যের ডিবা পাইয়াছিলেন, তাহাই হেডমাষ্টারের কাছে উপস্থিত করায় আজ ইহাদের বিপদ।

প্রতুল সে দলে নাই।

মনের মধ্যে একটা অতি তীব্র আত্মগরিমার ঢেউ বহিতে লাগিল। পাশে যাহাকে পাইল তাহাকেই ডাকিয়া বলিল, ওদের সঙ্গে আমি কোনোদিনই মিশি না, জানিস প্রিয়? ওদের যে এমনি একদিন ডাক পড়বে তাও যেমন জানতাম, ওদের বড়লোকিপনার জন্য ওদের সঙ্গে আমি মিশতাম না। হোলই-বা কেউ ম্যাজিষ্ট্রেটের বা সার্জেনের ছেলে, তাই বলে ওদের ফেউ হয়ে বেড়াবো সে পাত্তর প্রতুলকে পাও নি। কেন কি করতে যাব, ওদের ঘোড়াতেও চড়তে চাই না, মোটরের আশাও করিনে। ভুলুটাকে সেদিন সুখময়দের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, জানিস নে বুঝি? দেখ দেখি, গরজ করে এ-অপমান কে নিতে যায়—ছিছি ছিছি লজ্জাও করে না। ঘেন্না ধরে গেছে ভাই, কি হ্যাংলা। এখন ঠ্যালা বোঝো। ওদের সঙ্গে মিশে দুর্নাম বয়ে বেড়াবে কে বলতো?

কিন্তু শ্রোতার দিক হইতে কোন সাড়া না পাইয়া এতক্ষণে সে উত্যক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, তুই যে কিছুই বলছিস নে ?

প্রিয় বলিল, কি জানি ভাই, সব কথা বুঝিনে ...

প্রতুল সরোষে বলিল, বুঝিসনে মানে, না-বোঝার ভান করছিস বল, বলিয়া প্রতুল দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

টিফিন পিরিয়াডের পূর্ব্বেই নোটিশ আসিল, আজ বালকবালিকাদের সম্মেলন হইবে বলিয়া স্কুল অর্দ্ধেক হইবে।

সকলেই উল্লসিত হইয়া উঠিল, কেবল ছুটির জন্য নহে, বালকবালিকার সম্মেলন এক মস্ত আকর্ষণ। তাহারা ইতর কিনা মুনিঋষিরা বলিলে বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এইদিনটিতে মিষ্টান্ন বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া আহার্য্য ও উপদেশাদি যাহা দিবার দেওয়া হইত। এই বিশেষ পরিবেশে বসবাস করিয়া এবং নিয়মিত সানডে স্কুলে হাজির থাকিয়া প্রতুল একপ্রকার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। সানডে স্কুল মানে সুনীতি প্রচারের রবিবাসরীয় বৈঠক।

এইবার একটু নতুনত্বও ছিল। স্থির হইয়াছিল, কলেজের বিমল গুপ্ত নামে একটি ছেলে ম্যাজিক দেখাইবে। বাস্তবিক কি পরিষ্কার ইহার হাত। প্রতুলের মনে হইল; মন্ত্র—সব মন্ত্র। না হইলে এমন হয় ? বিমল গুপ্ত ভনিতা করিয়া বলিল : আপনাদের কেউ একজন আসুন।

তাহাদেরই পাড়ার ফিতুবাবু আগাইয়া গেলেন। তিনি কলেজের ছাত্র।

বিমল গুপ্ত বলিল, এই শ্লেটখানা দেখুন, এতে কিছু নেই, এখানা বুকে চেপে আপনি যা' খুসী ভাবুন, যা' ভাববেন তাই ঐ শ্লেটে লেখা পড়বে, আমি দেখবার আগেই তা' বলে দোব। তাহার পর কিছুক্ষণ কাটিল ; বিমল গুপ্ত বলিল, আপনি য়্যালেকজেণ্ডারের নাম ভেবেছেন, ঠিক কিনা ? বিস্মিত ফিতুবাবু বলিলেন, হ্যাঁ।

শ্লেট উল্টাইয়া দেখা গেল, ইংরাজীতে লেখা : Alexander.

কি একটা সাধারণ উপলক্ষ্যে অথবা হয়তো কোন উপলক্ষ্যই ছিল না, নেহাৎই বন্ধুত্বের খাতিরে, হয়তো বাড়ীতে একটা ভাল কিছু খাবারের জোগাড় ছিল ; সেই জন্যই মেজদা মধুবাবুকে খাইতে বলিয়াছিলেন।

মধুবাবুকে যদি কেবল শিক্ষিত বলা যায়, তাহা হইলে সবটা বলা হয় না। ভদ্র বলিলেও খানিকটা ফাঁক থাকিয়া যায়। তিনি শিক্ষিতও বটেন ভদ্রও বটেন কিন্তু তাহার রুচিটুকুই ছিল সর্ব্বাগ্রগণ্য। সঙ্গীতাদির প্রতি একটা বৈজ্ঞানিক ঝোঁক ছিল বলিয়া সামাজিকতায় তাঁহার একটা সুনির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। ভদ্রতাবোধের জন্য অন্দর মহলেও তাঁহার সুনাম ও সামাজিক যাতায়াত ছিল।

রং তাঁহার কালো, খুবই কালো, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় একটা সুষ্ঠু কৃষ্টি বিকশিত হইয়া লোকচক্ষু আকৃষ্ট না করিয়াই পারিত না।

জাতে ছিলেন একটু খাটো, কিন্তু সে নেহাৎ আদিম হিন্দু সমাজ বলিয়াই, নতুবা নীচতার পরিমাপে যদি মানুষের স্তরভেদ হইত, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ইঁহার স্থান প্রথম পঙক্তিতেই হইত। ইঁহার পিছনে ছিলেন, ইহাঁর পিতা এবং মাতা উভয়েই। সমাজে, অসভ্য সমাজ-বিধিতে, ছোট হইয়াও কেবলমাত্র স্বভাবের জন্য ইঁহাদের সকলেই সম্মান জানাইত। গ্রাম হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু সহরের আবহাওয়ায় পাড়াপ্রতিবেশীর, নেহাৎ ক্রিয়া কর্ম্মের ব্যাপার না হইলে, ইহাঁদের সমতা দিতে কাহারও কার্পণ্য ছিল না। অথচ পরমাশ্চর্য্য এই, এই সহৃদয়তার সুযোগে তাঁহারা তাঁহাদের এক ডিগ্রিও বড় বলিয়া দাবী করেন নাই, জন্মগত

সঙ্কীর্ণ স্থানকে পরম সন্তোষের সহিত মানিয়া চলিতেন। দেবীকান্ত এই স্বল্পতুষ্ট সুখী দম্পতিকে কোন দিন অবহেলা করিতে পারেন নাই, সাগ্রহে স্বেচ্ছায় মৈত্রী সম্বন্ধ পাতাইয়াছিলেন। মিত্রের সন্ন্যাসী মন দেবীকান্তকে মুগ্ধ করিত।

প্রতুলদের সংসারে ইহাঁদের প্রভাব তুচ্ছের নহে। অজ্ঞাতসারে ইহাঁদের সংযম, বিনয়, ভদ্রতা বহুলাংশে প্রতিভাত হইয়াছিল। মেজদার বন্ধু বলিয়া এ বাড়ীতে মধুবাবু মধুদা বলিয়াই পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং তাঁহার জন্য এ বাড়ীর দ্বার ছিল স্বভাবতঃই মুক্ত ও অবাধ। ইহাঁর উপস্থিতি সকলকেই উল্লসিত করিত।

কিন্তু ঠিক এই জায়গায় প্রতুল বিষাইয়া উঠিয়াছিল। এমন একটি বাঞ্ছনীয় সংসর্গ ও সাহচর্য্য কোন মুহূর্ত্তেও যে একটা ধুয়া লইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে, প্রতুলের ভাবিবার মত বয়স বা বুদ্ধি কিছুই ছিল না।

একবার মেজ বধূমাতা কঠিন অসুখে পড়িলেন। সেখানেও এই সংসারের উদ্বেগ উপশমে মধুবাবুর দান সামান্য ছিল না। তাঁহার সহযোগে মেজদার অক্লান্ত শুশ্রূষায় রোগী সারিয়া উঠিলেন। একদিন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মধুবাবু যখন সবেমাত্র নিজের বাড়ীমুখো চলিয়া গেলেন, তখন ওবাড়ীর বিন্দুবালা রুগ্না বধূমাতার খোঁজ লইতে আসিল। বিন্দুবালার স্বামী দারোগাগিরি করে, এই দারোগাগিরি একদিন সৌরীনই পাইতে পারিত। বিন্দুবালাদের অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। তাহার বাবা ছিলেন সম্পর্কে দেবীকান্তর জামাই। দক্ষিণে খানিকটা জায়গা অনর্থক পড়িয়া থাকিত, তাহাকেই বাসোপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য জায়গাটা দেবীকান্ত জামাইর হাতে দিয়াছিলেন। জামাই নিজে সুরসিক ও গুণী লোক ছিলেন; কাজেই এই পরিবারের সহিত কোনো দিন একটা বচসা ঘটিবারও অবকাশ হয় নাই। কিন্তু আদুরে বিন্দুবালা দারোগা-স্বামীর সোহাগে ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল; দেবীকান্ত থাকিতে

তাহার এই স্ফীতি প্রকাশ পাইতে পায় নাই বটে, কিন্তু কালে কালে ইহার প্রকাশের সম্ভাবনা দেখা দিতে লাগিল, কারণ তখন তাহার স্বামী প্রতিষ্ঠার দিকে ক্রমবর্দ্ধমান। বিন্দুবালার আদুরেপানা দেমাকে পরিণত হইয়াছিল।

বিন্দুবালা রোগ-পরিচর্য্যার জন্যে আসে না, আসে অসুস্থ একটা কৌতূহলে। সেদিনও যখন আসিল, প্রতুল সেইখানেই ছিল।

বিন্দুবালাকে চৌকাঠের দরজা ধরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া মেজদা বলিলেন, একটু বোস তো বিন্দু, সকাল বেলা থেকে আর হাত···

মাঝপথেই বিন্দুবালা বলিল, আমার যে কাজ আছে, মধুবাবু কই? মধুবাবু থাকলে আর কি কারও দরকার আছে? তিনি একাই একশো।

বিন্দুবালা বয়সে মেজদার অনেক ছোট। অথচ, ইহারই মুখে এ প্রকার অহেতুক কদর্য্য ইঙ্গিতপূর্ণ কথা শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বোধ জাগিয়া উঠিল যে, এই মিথ্যা নোংরামি ঘাঁটিতে যাওয়া আরও ন্যাক্কারজনক; মধুর যাতায়াত ইহারা পছন্দ করে না, ইহা হিংসা, না, কেবলই ক্ষুদ্রতা, মেজদা ঠাহর করিতে পারিতেন না। কিন্তু সেই মধু'র সহিত তাঁহার স্ত্রীর বাক্যালাপ বা মেশামেশি যে ইহারা কী চক্ষে দেখে তাহা মেজদা বুঝিতেন, কেবল আমল দিতেন না। আর এই মেয়েটা স্পর্দ্ধা করিয়া যে মুখোমুখি এমন আক্রমণ করিতে পারে, এই কথা ভাবিতেও তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। নিজেকে সংযত করিতে গিয়া একবার রোগীর উপর একবার প্রতুলের উপর চোখ পড়িল, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, তোর যদি অতই কাজ, তবে ডেপোমি না করে বাড়ী যা' দেখি।

পাল্টা খোঁচা খাইয়া বিন্দুবালা উঠানে নামিয়া আসিল বটে, বিমলাকে সম্মুখে পাইয়া অনেকটা রিহার্সেল দেওয়া পার্টের মত কতকগুলি কথা মুখস্থ বলিয়া গেল: কী এমন অন্যায় ব'লেছি ভেবে

পাইনে, মেলামেশা যদি না থাকতো তবে কথা ছিল, কিন্তু তেনার নাম করতেই ক্ষেপে উঠলেন। বলেছি কাজ আছে, কাজ কি আমাদের থাকতে নেই? আর মধুবাবু যদি না আসতেন তো আমরা কি মামীকে ফেলে দিতাম? এমনই কী দোষ ক'রেছি? বলিয়া সরোষে চলিয়া গেল।

যাহা বাকী ছিল তাহাও নগ্ন হইয়া গেল। রোগী তখন অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, মেজদাও ব্যস্ত ছিলেন; রোগী কিছুই শুনিল না, মেজদাও প্রায় সবটাই শুনিলেন না, শুনিবার প্রবৃত্তিও ছিল না, কিন্তু প্রতুল বিন্দুবালার প্রতিটি বর্ণ অজ্ঞতাসারে গিলিয়া যখন খাইল, তখন সেগুলির ভীষণ প্রতিক্রিয়ায় সে টলিতেছিল। কি কারণে যেন তাহাকে বিন্দুবালার দিকেই টানিতেছিল এবং বিন্দুবালার প্রতিটি ক্রুর উদগার তাহার কাছে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে হইতেছিল। পিসিমার প্রভাবে ছোটবেলা হইতে ভালবাসার ব্যাপারে অংশীদার হইতে প্রতুলের মন চাহিত না এবং একচেটিয়াত্বের প্রতি তাহার প্রবল আসক্তি; হয় দুশ্ছেদ্য আত্মীয়তা, না হয়তো অবিচ্ছিন্ন শত্রুতা, ইহাই ছিল তাহার কাম্য। যাহাকেই সে একান্তভাবে পায় নাই, তাহাকেই সে ঘৃণায় ত্যাগ করিতে চাহিয়াছে। ফলে তাহার অসামাজিক মন যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারই সহিত অপর কাহারও সৌহার্দ্দ্য বরদাস্ত করিতে পারিত না। বৌদিকে সে আপন করিতে পারে নাই, সেজন্য সে নিজেকে দোষী তো ভাবিতেই পারে নাই, সমস্ত দোষ নিরপরাধীর উপর চাপাইয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটাইতেছিল; একটা তিক্ত-বীজ যখন গোপনে তাহারই মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে চাহিতেছিল, তখন বিন্দুবালার পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনা ইহাকে জীয়াইয়া তুলিল বুঝি। বিমলা তো ছিলই, বিন্দুবালাও জুটিল, তবে আর সিঞ্চনের দুশ্চিন্তা কি? বৌদি, মধুদা, মেজদা সকলের উপর সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। আজ এমন একটা নিষ্ঠুর সমর্থন পাইয়া প্রতুল যেন রুদ্ধ-নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

এই অসন্তুষ্টি প্রকাশ না পাইয়া পারিল না।

একদিন তাহারা সকলেই খাইতে বসিয়াছে। মধুবাবু উঠানে পদচারণা করিতে করিতে প্রয়োজনীয় কথা বলিতেছিলেন। যে যাহার উত্তর দিতেছিল।

তেমনি স্বাভাবিক সুরে কথায় কথায় মধুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর শরীর এমন খারাপ হ'চ্ছে কেনরে, পুতু ?

প্রতুল শরীরের আলোচনায় লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইল। বলিল : তার আমি কী করব ? কথাটার অপ্রত্যাশিত ঝাঁঝে উপস্থিত সকলেই চমকিত হইল। মধুবাবু ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু বলিলেন : আয়নার একবার চেহারাখানা দেখেছিস ?

না। তেমনি ঝাঁঝ।

মধুবাবু তবু বলিলেন, দেখিস কণ্ঠা-টণ্ঠা সব বেরিয়ে গেছে।

প্রতুল বলিল, যাকগে।

মেজদা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, একটা ভাল কথাও ছেলেটার সহ্য হয় না, এমনি অসভ্য !

আর কোন কথা হইল না। কিন্তু ফল আরও খারাপ হইল ; নির্ব্বিরোধী বধূমাতার উপর রাগের মাত্রা তো কমিলই না, বরং ইহাঁরা যখন অত্যন্ত সাধারণ আলাপ করিতেন, তখন সে নিলর্জ্জের মত ইহাঁদের দেখিত এবং তাহারা যে কারণেই হউক, প্রতুলকে গ্রাহ্য করা দরকার মনে করিতেন না বলিয়া প্রতুলের আক্রোশ শতগুণে বৃদ্ধি পাইত।

তাই সেদিন মধুবাবুর নিমন্ত্রণে আহূত হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে প্রতুল ঘোষণা করিয়াছিল, সে কোন ছোট জাতের সহিত এক জায়গায় বসিয়া খাইবে না। এই অত্যন্ত বিসদৃশ ছেলেটার ঝগড়াটেপনার নিত্য নতুনতায় পরিবারের সকলেই বিপর্য্যস্ত ছিল সত্য, কিন্তু এইবারকার আকস্মিকতায় সকলেই প্রমাদ গুণিল। এতকাল তাহারা একসঙ্গে পরম তৃপ্তির সহিত খাইয়া আসিয়াছে, কোন প্রশ্ন

জাগে নাই, আজ কোন ছলে মধুবাবুকে পৃথক খাইতে দেওয়াও চলে না ; কেবল বাহিরে নহে মনে তাহাতে যে আঘাত লাগিবে, তাহা অসহ্য। এই লজ্জাহীন জেদী ছেলেটার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, হয়তো তাঁহার সমক্ষেই একটা নিষ্ঠুর কটুক্তি করিয়া বসিবে ; তখন লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা থাকিবে না, ঢাকা-চাপার সকল কলাকৌশল ঐ বুদ্ধিমান ব্যক্তিটির কাছে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হইয়া দেখা দিবে। সকলেই প্রাণপণে এক-একবার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বাঁকা প্রতুলকে সোজা করা গেল না। সে স্বয়ং একখানা পিঁড়ি লইয়া শুচিতা রক্ষা করিতে একেবারে আর এক ঘরে গিয়া বসিল। একপক্ষে এ ভালই হইল। তখনও সকলের খাওয়া বাকী ; ইতিমধ্যে প্রতুলের খাওয়া হইয়া যাইবে, তখন ক্ষুধার একটা চলতি কৈফিয়ৎ দেওয়া চলিবে। কিন্তু কি একটা খাদ্য তখনও ছিল, পেট ভরিয়া গেলেও প্রতুল উহারই প্রত্যাশায় যখন বারে বারে থালা চাটিতেছিল, তখন মধুবাবু প্রবেশ করিলেন। প্রতুলকে ঐভাবে দেখিয়া বলিলেন, কিরে, একেবারে খেতে বসে গেছিস যে বড় ?

যাঁহাকে লইয়া প্রতুলের এত আপত্তি তাঁহার সম্মুখে সে নির্ব্বাক হইয়া গেল। বড়দা আশ্বস্ত হইলেন। পাছে প্রতুল কিছু একটা বলিয়া বসে এই ভয়ে মেজদা তাড়াতাড়ি বলিয়া বসিলেন, ওর খিদের যা চাড়, এই হয় তো এই দাও।

মধুবাবু বলিলেন, তা সাতরাজ্যি ছেড়ে এখানে কেন ?

মেজদা বলিলেন, খেয়াল—ওর খেয়ালের তো অবধি নেই ? হ'লেই হল। কিন্তু দেখছি ভালই হ'ল, ওখানে খেলে এঁটোকাঁটা পড়ে থাকত বৈত নয়—চাকর তো আসছে সেই সাড়ে বারোটায়।

মধুবাবু বলিলেন, আমারও যে এদিকে পেট চই-চই, চল বসিগে।

মেজদা বলিলেন, চল চল, বড়দা, এই—আরগুলো গেলো কোথায়, সরু....ইত্যাদি নানাপ্রকার গোলমাল করিয়া মেজদা

অনাবশ্যক রকমে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং প্রতুলের নীরবতায় খানিকটা খুসী হইয়া বলিলেন, আর একখানা মাছ খাবি ?

কিন্তু ইতিমধ্যে তাহার বিক্ষুব্ধ মেজাজ অন্যদিকে প্রধাবিত হইল। সকলেই এখন সোরগোল করিয়া খাইতে বসিবে, কেবল সে-ই থাকিবে না। এই বঞ্চনা তাহাকে পীড়িত করিতেছিল, তাই মেজদার প্রশ্নের উত্তরে থালার উপর বার দুই তর্জ্জনীটা ঘষিয়া মুখে দিতে দিতে 'না।' বলিয়া উঠিয়া পড়িল। হাত মুখ ধুইয়া যখন সে অত্যন্ত বিষণ্ণ বদনে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন পৃথিবীর আর কাহারও সহিত লড়াই করিবার প্রবৃত্তিও যেমন তাহার ছিল না, পৃথিবী হইতে রসাস্বাদ গ্রহণ করা যায় এই ধারণাও তাহার আসিল না। নিজেকে ভয়ানক ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু বুঝিল না তাহা কোথা হইতে সুরু করিবে। পরকে কিছু বলিতেও আজ মন চাহিল না, পরকে আপন করিয়া লইতেও পারিল না। অকস্মাৎ ঘরে টাঙানো গৌরাঙ্গের ছবিখানা চোখে পড়িল। মেরেছ কলসীর কানা…। সত্যিই কি এ সম্ভব ? যে মারে তাহাকে ভালবাসা যায় ? বড়দাকে সে ভালবাসে ? কই, না, কি রকম ভালবাসা ? বড়দা যদি না থাকেন, যদি বাবার মত…প্রতুল ভাবিতে পারিল না। পিসিমা নাকি তাহাকে খুবই ভালবাসিতেন। মা কি ভালবাসিতেন, মা, তাহার মা, তাহার আপন-মা ? কি জানি ? মেজদাকে সে ভালবাসে ? না, ভয় করে ? ভয়-ই করে। মেজ বৌদিকে, উহুঁ। বড় বৌদিকে ?—বোধ হয় কোন একদিন, কিন্তু আজ নয়। সেজদাকে ?—মনে পড়ে না, কেবল ঝগড়ার কথাই মনে আসে। ঐ ছোটগুলি ? তাহাদেরও সে মারিয়াছে। তাহার এই মা'কে, সৎমাকে ?—আঃ, মোটেই না। তবে কাহাকে সে ভালবাসে ? অশ্বিনীবাবু তাহাকে ভালবাসিতেন, সে নিজে কি বাসিত ? প্রতুল তন্ন তন্ন করিয়াও ইহার জবাব পায় না। ভালবাসা যে কি ভাবিয়া পায় না। এক এক সময় একটা আকর্ষণ বোধ হয়। সেই বড়

বৌদি। সেই ভাইগুলি। ছোটগুলিকে মাঝে মাঝে জড়াইয়া ধরে সে—ইহাই কি ভালবাসা? দূর, ভালবাসা অসম্ভব। তবে গৌরাঙ্গ ভালোবাসেন বলিয়া লোকে বলে কেন? কি জানি ছাই। চিন্তার মাথামুণ্ডু কোথায় যে লইয়া যায়।

তাহার আজিকার এই আচরণ হয়তো বাড়ীর কয়েকটি প্রাণী ছাড়া বাহিরের লোকে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিবে না; কিন্তু এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কয়েক জোড়া চক্ষুর সম্মুখেই তাহার এই সুকঠোর অনুদারতা এমনভাবে নগ্ন হইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া প্রতুলের সমগ্র মন যেন বিশ্রদ্ধায় ছি-ছি করিয়া উঠিল। চক্ষু দুইটায় ভীষণ জ্বালা করিয়া কেমন একটা অশ্রুর ধারা বন্যার মত দুরারোধ্য গতিতে প্রতুলের কপোল বাহিয়া গড়াইতে লাগিল। এমনি অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিয়া এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িল। মানসিক এই অবস্থায় সুপ্ত প্রতুল স্বপ্ন দেখিল, একটি কালো হাতী তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে; প্রতুল ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াও পালাইতে পারিতেছে না; পা-জোড়া হাঁটুর কাছে ভাঙিয়া ভাঙিয়া যায়, আর হাতীর শুঁড়টা ঠিক তাহার পিছনে সুড়সুড়ি তোলে; হাঁপাইয়া ঘামাইয়া অস্থির; কোন গোপন স্থানই হাতীটার কাছে অগোপন থাকে না। প্রতুল চীৎকার করিতে চায়, পারে না। কে যেন অস্ফুটস্বরে তাহাকে ডাকিতেছে; সে উত্তর দিতে পারে না।

কি রে—

প্রতুল জাগিয়া ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। মধুবাবু বলিতেছিলেন, কিরে, অমন কচ্ছিলি কেন, স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি?

প্রতুল সচকিত হইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, হ্যাঁ। বলিয়াই পর মুহূর্তে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

মধুবাবু বলিলেন, লজ্জা পেয়েছে।

শনিবার হাফ স্কুল। প্রশস্ত পরিষ্কার রাঙাপথ। শ্যামনগরের বিখ্যাত সুন্দর পথ। সোজা চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়া ঠেকিয়াছে তাহাও সে জানে। সেই পথ ধরিয়া প্রতুল আসিতেছিল। আরও কয়েকজন সঙ্গী ছিল। সরকারী কবিরাজখানার ওখানে আসিয়া সকলেই থমকিয়া গেল। সেখানে কি একটা উৎসবে ভারী ভীড় লাগিয়াছে। স্কুলে যাইবার কালে তত ভীড় না থাকিলেও চোখে পড়িয়াছিল, কিন্তু তেমন আকৃষ্ট করে নাই।

নরেন বলিল, চ' ঢুকে পড়ি, রামকৃষ্ণের জন্মোৎসব, কারো বাধা নেই।

অজিত বলিল, খিচুরী আর লাবড়া, ফাষ্ট' ক্লাশ, চল প্রতুল।

নরেন বলিল, শ্রীক্ষেত্র, সবাই এক এখানে, চমৎকার।

তাহারা যাইতেই বয়স্কদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, এসো এসো, বাবারা, একদম ভেতরে এসো।

প্রতুল বলিল, যাই, পূজোঘরটা দেখে যাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমংসদেবের একখানা ফটোকে সর্ব্বপ্রযত্নে সাজানো হইয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ আরও দুই একজন শিষ্যের ছবি টাঙানো; তাঁহাদেরই মুখনিঃসৃত অথবা লিখিত বাণী বড় করিয়া লিখিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহারই একটিতে প্রতুল নিবিষ্ট মনে চোখ বুলাইতেছিল। অকস্মাৎ নরেনের ধাক্কায় তাহার চমক ভাঙ্গিল; তাহাকে একপ্রকার টানিয়া লইয়া নরেন যখন উঠানের মাঝখানে বসাইয়া দিল, তখন সে দেখিল, যে-লেখা সে এইমাত্র পড়িয়া আসিয়াছে তাহারই প্রতিচ্ছবিরূপে এইখানে জাত-বেজাত লইয়া মারকাট করিতে কেহ নাই। যেন কোনদিন এ-প্রশ্ন সমাজে উঠে নাই এই ভাবে পরম নিশ্চিন্তে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিতেছে।

গোরাঙ্গ পূজার আর পাঁচদিন মাত্র বাকী; সেই খাগড়াবাড়ী সেই কৃষ্ণনগরের কারিগরকে মূর্ত্তি গড়িবার বায়না দিতে হইবে এবং যাহাতে একদিন আগেই পাওয়া যায় সেইজন্য তাগিদ দিতে হইবে। এদিকে চাঁদা আদায় সমূহই বাকী: এমনও নহে যে, স্কুল বন্ধ; একটা ছাবড়া তুলিতে হইবে; খুঁটিনাটি এটা-সেটা কত কাজ যে বাকী পড়িয়া আছে তাহার সংখ্যা নাই; অথচ কেহই যেন গা লাগাইতেছে না; নীলকুঠি বা বগড়িবাড়ীর হাট করিয়া সস্তায় তরিতরকারী কিনিতে হইবে; কি যে করিতে হইবে না তাহার ঠিকানা নাই।

প্রতুলের উপর দুশ্চিন্তার পাহাড়।

দুশ্চিন্তাই হউক আর যাহাই হউক, ঘটনা আসিয়াও যায় ঘটিয়াও যায়। প্রথমে বয়স্করা কেহই যোগ দেন নাই, ছেলেমানুষদের একটা বনভাতগোছের কল্পনা করিয়া বড় একটা ঘেঁষেন নাই, কিন্তু পরমোৎসাহে উহারাই যখন গৌরাঙ্গ মূর্ত্তিটি ছাবড়ায় আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিল, তখন এই মূর্ত্তিপূজার দেশে ইহার মহিমাকে বয়স্করা কেহই অবহেলা করিতে পারিলেন না। এটা করিলে ভাল হয়, এটা করা হয় নাই কেন ইত্যাদি ভুলচুকের ফাঁকা জায়গায় তাঁহারা আবির্ভূত হইতে লাগিলেন এবং যেখানেই হঠাৎ ঘাটতি আসিয়া দেখা দিল, সেখানেই ইঁহারা বাধ্য হইয়া দায়িত্ব লইতে লাগিলেন। 'যা নিয়ে আয়, খরচা আমি দেব', অগত্যা অনুসন্ধানকারীকে বলিতেই হয় এবং বালখিল্যেরা অধিকতর উৎসাহে নিজেদের কোন শ্রমই ভীষণ মনে করিতে পারে না। আর ভক্ত-সেবকেরা মূর্ত্তি

দর্শনের সহিত খিচুরী প্রসাদ গ্রহণের জন্য যে কোথা হইতে দলে দলে আসিতে লাগিল তাহা কেহই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু পরমাশ্চর্য্য এই যে, ইহার জন্য ব্যবস্থাপকেরা বিরক্ত তো হইলই না, বরং পূজা ও উৎসব উপলক্ষ্য করিয়া যে ভীড়, ঠেলাঠেলি, ছুটাছুটি হইল তাহাতে প্রতুলেরা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। চাউল, ডাল, 'বাড়ন্ত' হইয়া যাইতেছে দেখিয়া কোন-কোন অভিভাবক স্বেচ্ছায় নিজেদের ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন—যেন, এই ব্যাপারে দায়িত্ব তাঁহাদেরই।

প্রতুলকে সর্ব্বাধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল পুরোহিতটি; তাঁহার মাথার চুল, গোঁফ, দাড়ি সবই পাকিয়া এমন সুশ্রী হইয়াছিল এবং তাহা এমন পরিপাটি করিয়া বিন্যস্ত ছিল যে, বহুবার তাঁহাকে অদেখা মুনিঋষিদের সহিত সে তুলনা করিয়াছে। আর, চাকর বাকরের সর্ব্বদা উপস্থিত থাকা সম্ভব নাই বলিয়া প্রতুল নিজেই কত যে এঁটো পাত তুলিয়াছে, কতবার জায়গাটা ঝাঁট দিয়াছে, তাহার হিসাব নাই। কিন্তু এই কাজ করিতে গিয়া সে কতখানি গৌরব বোধ করিয়াছে তাহারও পরিমাপ চলে না। কর্মশ্রমের চাইতেও আত্মতৃপ্তি বেশী বোধ করিল। আজ নিজেকে ভাল লাগিল, পরকে ভাল লাগিল, ভালবাসিল; কিন্তু সম্ভবত সবচাইতে বেশী ভালবাসিল নিজেকে। উৎসবের সর্ব্বব্যাপারে তাহার দুশ্চিন্তা ছিল যেমন ব্যাপক, নিজের সর্ব্বকর্ম্মে তেমনি ছিল সীমাহীন আস্থা।

সান্ধ্য আরতির পর কীর্ত্তনের ব্যবস্থা ছিল। এ কীর্ত্তনে পয়সার সম্পর্ক নাই; যে গাহিতে পারে, যে বাজাইতে পারে, যাহার ভক্তি আছে, ডাকিলেই তাহাকে পাওয়া যায়; কীর্ত্তন জমিয়া উঠে। সেদিনও জমিয়াছিল। প্রেমভক্তির অব্যক্ত দোলায় প্রতুলকে নাচাইয়াছে, সঙ্গীতে প্রতুল যোগ দিয়াছে, সুকণ্ঠ নহে বলিয়া লজ্জা পায় নাই, গীতবাদ্যে করুণ আবেদনের নিগূঢ় তথ্য অস্পষ্ট হইলেও তাহাকে রীতিমত আঘাত দিয়াছে; খোল-বাজিয়েদের মৌখিক বোল্

"ঝিঙার ফুল কাঁকুড় কাঁকুড়" "দিবি কি না দিবি বল, না দিস তো থানায় চল" ইত্যাদি তাহার চিত্তে কৌতুকের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিয়াছে।

পরদিন ছিল খেলাধুলার প্রতিযোগিতা; প্রতুল তাহাতে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। কি করিয়া এবং কেন খেলাধুলা হইতে প্রতুল একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে নিজেও বলিতে পারে না। তবে ভীতির কল্পনা যে তাহাকে অনেকাংশেই পিছটান মারিত ইহা সে নিঃসন্দেহে বুঝিত। নতুবা তাহাদের স্কুলে খেলাটা ছিল বাধ্যতামূলক। খেলার মাষ্টার ছিলেন। রুটিনে খেলার নির্দিষ্ট সময় ছিল, বৈকালিক খেলা ও ব্যায়ামাদির ব্যবস্থা তো ছিলই। শিশুদের ড্রিল হয়, হাডুডু হয়, হাডুডুর জন্য কাপ দেওয়া হইত। ফুটবল দেওয়া হয়। ক্রিকেট, হকি, টেনিস, কোন ব্যবস্থারই কার্পণ্য ছিল না। শ্যামনগরের বাহিরে খেলিয়া আসিবার জন্যও অর্থবরাদ্দ ছিল। ইহার উপর স্পোর্টস ছিল, পড়ার প্রাইজের মত খেলার প্রাইজও প্রচুর ছিল। দলে পড়িয়া প্রতুলকে যোগ দিতে হইত, মাঝে মাঝে উৎসাহও বোধ করিত। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে ভীরুতাই তাহার প্রবল শত্রু হইয়া পথ রোধ করিত। ফুটবল খেলায় ফাঁকা দুই একটা লাথি মারিত; কিন্তু কেহ ছুটিয়া কাড়িতে আসিলে যদি হাঁটুটা ভাঙ্গিয়া যায়, যদি পায়ের জোড়াটা খুলিয়া যায়, মাথায় নাকে বুকে দেহের অন্য কোন অংশে ঠোকাঠুকি লাগে, উঃ। কল্পনা করিতেই সে আধমরা হইয়া যায়। ক্রিকেট খেলায় সর্বপ্রথম চিন্তা: অতর্কিতে যদি বল আসিয়া কপালে বা মাথায় লাগে, ইস্, কত জোরে সেটি আসে। অথবা বল ব্যাটে না লাগিয়া বাঁকিয়া যদি গায়ে লাগে বা বুড়ো আঙুলটা থেঁতলাইয়া দেয়—ওরে বাসরে। হকি খেলায়: লাঠি লইয়া খেলা, বলতো ঐটুকু, আহা ইচ্ছা করিয়া না হউক, ফসকাইয়াও তো অপরের লাঠি গায়ে লাগিতে পারে? আর বলের তো কোন দিগ্বিদিক জ্ঞান

নাই, একবার গলায় কণ্ঠনলীতে আসিয়া লাগিলেই হইল, ব্যস। হাডুডু খেলায়ঃ কেহ তো আর অত বিচার করিয়া জড়াইয়া ধরে না, খেলায় অত হুঁসও থাকে না, সকলেই মরিয়া হইয়া খেলে, কিন্তু চোট লাগিতে তো তাহারই লাগিবে? নাঃ।

অথচ কোন খেলার প্রতিযোগিতায় সে অনিবার্য্যক্রমে বা স্বভাবক্রমে বাদ পড়িলে কোথা হইতে অভিমানের বাষ্প তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত এবং যাহারা নিয়মিত নির্ব্বাচিত হইত তাহাদের প্রতি হিংসায় জ্বলিয়া মরিত; অত্যন্ত কৃপণের মত যোগ্য পাত্রদের প্রশংসা করিত। এই হিংসার ঝোঁকে ও ধাক্কায় চেষ্টা চলে, কিন্তু সুফল পাওয়া যায় না, পরাজয়ের গ্লানি থাকিয়া যায়, প্রবঞ্চনায় প্রপীড়িত হইবার পর হিংসার ছাইটুকু থাকিয়া যায়। এই ছাইটুকুকে নিঃশেষে উড়াইয়া দিবার জন্য প্রতিবারই কোন একটা আকস্মিক গৌরবের ঝড় উত্থিত করিতে সম্ভাবনার সকল পথ খুলিয়া রাখিত। প্রতিযোগিতা একপ্রকার লাগিয়াই আছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই পয়সা খরচ নাই, ম্যাচ খেলা-পিয়াসী লোকেরও অভাব নাই, এগারোজন জুটাইয়া কাপ্তেনী করাও সহজসাধ্য; কিন্তু হার্ডেল রেসে সে যেমন সকল হার্ডেল সন্তর্পণে ডিঙ্গাইয়া গিয়া দেখিত নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গিয়াছে, এক্ষেত্রে ফললাভ তেমনি দুষ্প্রাপ্য রূপেই দেখা দিত।

পড়াশুনার ক্ষেত্রেও তেমনি একটা অক্ষমতা তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত। তেমনি উৎকণ্ঠা, তেমনি উচ্চাশা, তেমনি অপরকে পরাভূত করিবার স্পৃহা। যাহাদের স্মৃতিশক্তি প্রখর, যাহারা উল্লেখযোগ্য, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান সে পাইতে চায়, পাইয়াছে বলিয়া স্বপ্ন দেখে, মুহূর্ত্তের বিহ্বলতায় নিজেকে হারাইয়া ফেলে; কিন্তু স্মৃতিধরেরা সর্ব্বত্র এমন করিয়াই জুড়িয়া বসিয়াছে যে, তিল-মাত্র ধারণের স্থান নাই, লেজ গুটাইয়া আপনা আপনিই তাহাকে পিছু হটিয়া আসিতে হইত। ছোট থাকিতে নীচের ক্লাশে একবার এক

পরীক্ষায় বহু ছেলেই অঙ্কের পর অঙ্কে পূর্ণ নম্বর রাখিয়া যাইতেছিল, মোট নম্বর দেড়শো ; একশ ত্রিশ যখন পূরিয়াছে, তখনই প্রতুলের একটি দশ-মার্কওয়ালা অঙ্কের ফল ভুল হইয়া গেল ; পূর্ণ নম্বর হইতে তাহার দশ নম্বর কম থাকিবে মনে করিয়া সে প্রকাশ্যে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সতীর্থেরা কৌতুকবশত হাসিতে লাগিল। কিন্তু মাষ্টার মহাশয় সমব্যথায় তাহাকে সদরে ডাকিয়া ক্ষতিপূরণ বাবদ অন্য আর একটি অঙ্ক দিয়া শুদ্ধ ফল পাইলে পাঁচটি নম্বর দিলেন। তাহাতে প্রতুলের প্রকাশ্য ক্রন্দনের উপশম হইল, কিন্তু একশো পঞ্চাশের মধ্যে একশো পঁয়তাল্লিশ পাইবার খচখচি তাহার কোনকালে যায় নাই। উত্তরকালে, পঙ্গুতার প্রমাণ আরও প্রকাশ পাইয়াছে, কেবল ছোটকালের প্রকাশ (ক্রন্দন) উৎসারিত হয় নাই, নতুবা সেই ব্যথার স্থানটাই যেন টনটনিয়া উঠিত ; অভিমানে হিংসায় বহুকালব্যাপী ভিতরটায় একটা ফাঁকা হাহাকার অনুভব না করিয়া পারিত না। সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসের ছন্দে নিজেকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিত যে, সকল পরীক্ষা যদি সে একদিন পাশ করিতে পারে, এবং সে যে তাহা করিবে সে সম্বন্ধে তাহার কোন সংশয়ই ছিল না, সেদিন সে নিশ্চয়ই এইভাবে অবহেলিত হইবে না ; আর যদি হঠাৎ কৃতকার্য্যতা একদিন বরমাল্য লইয়া আসেই—আসিবে, এই আকাঙ্ক্ষাই তাহাকে উন্মুখ করিয়া রাখিত, তখন নিশ্চয়ই সে আরও উন্নত হইবে, প্রশংসিত হইবে, সুনাম কস্তুরীগন্ধের মত চতুর্দ্দিকে বিকীরিত হইবে, কত লোকের যাওয়া-আসা, আদর আপ্যায়ন ব্যাকুলিত করিয়া তুলিবে। চিন্তা এমনি উন্মত্ত।

বিদ্যাসাগরের দারিদ্র ও জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা তাহাকে আকৃষ্ট করিত এবং দারিদ্রের ভিতরে সরল জীবন যাপনের প্রতিজ্ঞাটা আসিয়া পড়ে ; কিন্তু কেমন করিয়া তাহারই সূত্র ধরিয়া ভাবিতে ভাবিতে দাসদাসী গাড়ীঘোড়া দালান-কোঠা ফুটিয়া উঠিত, তাহা সে জানিতেও পারিত না। হঠাৎ নিজের কাছে ধরা পড়িয়া গেলে সরমজড়িত কুণ্ঠায়

নিজেকে এই বলিয়াই বুঝাইত যে, এত সত্ত্বেও তাহার ব্যক্তিগত জীবন হইবে ধুতি চাদরের, অহঙ্কারের লেশমাত্রও তাহাকে স্পর্শ করিবে না এবং কবে কে নাকি বড় হইয়া বিলাত হইতে মেম বিবাহ করিয়া ভারতীয় বন্দরে নামিয়া নিজের বাবাকে চিনিতে পারে নাই, তেমন লজ্জাকর কুকার্য্য সে নিশ্চয়ই করিবে না, তাহার মাতৃভক্তি, তাহার আত্মীয় প্রীতি, তাহার প্রতিবেশীর প্রতি সহজ দরদ একটা জনশ্রুতিতে পরিণত হইবে।

বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী একখানা বাড়ীতেই ছিল। এক প্রকার লুকাইয়া যখন সে তাহা সারা করিয়া ফেলিল, তখন সে নিশ্চিত ঠিক করিয়া ফেলিল যে, সে বঙ্কিমচন্দ্র হইবে। "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ।" শান্তি, জীবানন্দ, নগেন্দ্র, দেবী চৌধুরাণী, ভ্রমর অনর্গল তাহার কলম হইতে নির্গত হইতে থাকিবে আর বাহির হইবে কমলাকান্তের দপ্তর, বাহির করিবে তেমনই তীক্ষ্ণধার "বঙ্গদর্শন"। শরৎবাবুর অরক্ষণীয়া পড়িয়া বঙ্কিমকে ছাড়িতে পারিল না বটে, কেননা, বঙ্কিমের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, কিন্তু শরৎবাবুর প্রকাশভঙ্গিমা তাহাকে মুগ্ধ করিল এবং একইকালে রামেন্দ্রসুন্দরের লেখা পড়িয়া ঠিক করিল, ত্রিবেদীর বলিবার কায়দা, শরৎবাবুর ভাষা ও ভাব, বঙ্কিমী প্রতিভার আওতায় পুষ্ট করিয়া তুলিবে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাহার জানার মধ্যে প্রায় কোনো বই-ই বাদ পড়িল না। কিন্তু যখন দেখা গেল, কষ্টকল্পনা করিয়া না হওয়া যায় বঙ্কিম বা শরৎ, না হওয়া যায় ত্রিবেদী, তখন তাহার নৈরাশ্যের অবধি থাকিল না, কেবলমাত্র বয়স হয় নাই এই কৈফিয়ৎ নিজের কাছে নিজে জোগাইয়া অস্থিরতার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথকে সে আদৌ বুঝিতে পারিত না বলিয়া তাঁহাকে মোটে আমলেই আনিত না। সমপাঠীদের কাছে বলিত, হ্যাঃ, যিনি একখানা মেঘনাদ বধ বা বৃত্রসংহার বা রৈবতকের মত—ইয়ে মহাকাব্য লিখলেন না, লিখলেন না মানে কি, লিখতে পারলেন না, তিনি আবার মহাকবি! অন্ততঃ যোগীনবাবুর শিবাজীর

মতও তো একখানা বেরোতে পারত? বলিতে বলিতে একেবারে তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র—যাহা জানিবার প্রতুলের কোনো অবকাশই ছিল না—আনিয়া নিজেকে ও শ্রোতাকে বিষাইয়া তুলিত। বস্তুতঃ, দুর্বলের, অক্ষমের যাহা হয়, সেই অহঙ্কার, ক্রোধ, আক্রোশ সব কিছুই তাহাতে গিজ গিজ করিত এবং যে কোন সূত্রে অত্যন্ত কর্কশ-কণ্ঠে তাহা বাজিয়া উঠিত। এই পৃথিবীতে কাহার বিরুদ্ধে যে তাহার নালিশ, জিজ্ঞাসা করিলে সে স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিত না, কিন্তু সংসারটার উপর তাহার যেমন ছিল অসীমা ঘৃণা, সতত লক্ষ্য ভ্রষ্ট শত্রুকে জয় করিয়া পদদলিত করিবার স্পর্দ্ধাও তেমনি উত্তাল হইয়া উঠিত। সকল ব্যাপারেই সে পশ্চাতে থাকিত বলিয়া কোনো একটা ব্যাপারে অদ্বিতীয় হইতে পারিলে সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারিত; মানুষের কোন সম্পর্কেই কাহাকেও অংশ দিতে রাজী নহে বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি তাহার অসহ্য হইত; তাহার সর্দ্দারিতে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে না পারে ইহাই সে সর্ব্বপ্রযত্নে চাহিত; তাহার ভালো বা মন্দের জন্য কেহ কিছু বলিলে সে যেমন উত্তেজিত হইত, কেতাবে যাহা লিখিত থাকিত তাহার প্রতি ছিল প্রতুলের তেমনি অগাধ শ্রদ্ধা; লোককে সে বিশ্বাস করিত না, কিন্তু গ্রন্থে তাহার বিশ্বাসের অবধি ছিল না। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি বিবাগী মন তাহাকে প্রায়ই নাড়াচাড়া দিত; একদিকে এই ঘৃণিত সংসারকে জয় করিবার ইচ্ছা—অন্য দিকে ইহাকে তেমনিই বিদ্বেষে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া—এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি তাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল এবং স্কুল বা ছাত্র-জীবনেই বিনিদ্র রজনীর চরণরেখা কপালে অঙ্কিত হইতে লাগিল। শারীরিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল না, কিন্তু মানসিক ফল লাভ একবিন্দুও হইল না এবং এই তুষ্টির অভাবই তাহাকে কোন মীমাংসায়ই পৌঁছাইতে দিল না।

অশ্বিনী মুহুরীর কথা মনে পড়ে; সে প্রতুলকে গৈরিক পোষাক,

চিমটা, কমণ্ডলু দিবে বলিয়াছিল; এই কয়েকটি বস্তুকে আশ্রয় করিয়া কতদিন কতশত কল্পনার জাল বুনিতে বুনিতে কোন এক শান্ত তপোবনে যে সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিত তাহার ঠিক ছিল না। কিন্তু পরক্ষণেই হয়ত বাস্তব জীবনের অক্ষমতা তাহার সকল স্বপ্ন চুর চুর করিয়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া অণু পরমাণুর পুনর্গঠনে হিংস্রতার মুর্ত্তি গড়িয়া তুলিত। ইহা ছাড়িয়া আঘাত করিতে অথবা ইহাকে কাড়িয়া আঘাত করিতে কোনটাই পারিত না; ফলে, এই না পারার আফশোষের উষ্ণদীর্ঘ অভিশাপ পাহাড় তাহাকে পিষ্ট করিত। ভাবিত, লৌকিক সংসারে বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গেলেন, কি ফোর্ড সাহেব দৃঢ়তর গাঁথুনি গাড়িলেন? তাহার মীমাংসা কোথায়? সেই "মাই ব্রাদার্স এণ্ড সিষ্টার্স অব আমেরিকা" আর পাঁচমিনিট হাততালি অথবা মিনিটে হিসাব করিয়া যাহার ঐশ্বর্যের হিসাব মিলে না? ভারতবর্ষে জন্মিয়া প্রবঞ্চিতের ত্যাগের মহিমা তাহাকে আকৃষ্ট করিত বটে, কিন্তু প্রাচ্যের ঘাড়ে যে পাশ্চাত্য আসিয়া বসিয়াছে? কেবল তো জোর জবরদস্তি নহে অস্ত্র-শক্তির পাশাপাশি ইহার কৃষ্টি ইহার সভ্যতাও যে প্রতুলের অন্তঃকরণ ও মস্তকের সর্ব্বত্র কাটিয়া কাটিয়া বসিয়াছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের অধিবাসী ভূগোলের জোরে হয়তো ভারতীয়ই ছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রতুল পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অস্বীকার করিয়া নিজেকে অমিশ্র ভারতীয় বলিবে কোন্ জোরে? রক্তমিশ্রণে বাহিরের দেহ লইয়া যাহারা জন্মাইল তাহারা হইল ইঙ্গ-ভারতীয়, আর যাহারা অপ্রকাশ্যে রক্তে মজ্জায় ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া গেল তাহারা বুঝি খাঁটিই থাকিয়া গেল। কেবল ইংরাজী না জানার জন্য যদি তাহার ঠাকুরদা' বাঙালী থাকিয়া থাকেন, তবে কেবল ইংরাজী জানিয়াই প্রতুল বস্তুতঃ ইঙ্গ-বঙ্গীয় হইয়া গিয়াছে। তাহার ঠাকুরদার পিছটান একান্ত ভাবে ছিল প্রাচ্য বা বাংলা, প্রতুলের পিছটান ও সম্মুখটান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের—বাংলা

ও বিলাতের। বিবেকানন্দের যুগ হইতে যে স্পষ্ট বিস্তৃত অস্থিরতা বাংলায় প্রকাশ পাইয়াছে, প্রতুল তাহার একটি ভ্রূণ সংস্করণ মাত্র। কাজেই, তাহার চিত্তের এই অ-স্থিরতা তাহার সংশ্লিষ্ট কার্য্যজগতে প্রতিফলিত না হইয়া যায় না।

ঘটনা ঘটিয়া যায় এই মাত্র। কিন্তু কখন কোন্ ঘটনা দ্রষ্টা বা শ্রোতা বা পাঠক বা উপস্থিতের উপর কিভাবে কতখানি বা কতটুকু ছাপ রাখিয়া যায়, তাহা কেহই জানে না। যখন যে ব্যাপারেই যে কেহ সিদ্ধান্ত করে, সে মনে করে ইহা আমার ইচ্ছাধীন এবং আমিই স্থির করিয়াছি। কেবলমাত্র দৈবকে যাহারা মানে, তাহারা পৃথিবী হইতে হয় সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে, নতুবা তাহারা আশাতিরিক্ত ঐশ্বর্যশালী হইয়া বসিয়াছে বলিয়াই ঐ নীতিবোধের প্রচার বাঞ্ছনীয় মনে করে—ইহলৌকিক ঐশ্বর্য-ক্ষমতার গভীরতা যাহারা জানিয়াও স্বীকার করিতে চাহেনা, অথবা হয়তো সত্যসত্যই বুঝেনা। না হইলে নিজের পৌরুষের জয়ডঙ্কা একবার বাজাইয়া দেখে। তাহার কারণ বোধ হয় যে, কোনটাই একান্তভাবে সত্য নহে, দুইয়ে মিলিয়া একম্।

বাহির বাড়িতে বসিয়া জটলা হইতেছিল; ছোট বড় সকলেই ছিল। প্রতুলের কানে গেল, কে বলিলেন, ফিতুবাবু পাগল হয়েছেন।

মেজদা বলিলেন, এ যে হবে আমি আগেই জানতাম।

ফিতুবাবু মেজদার সমপাঠি ও বন্ধু। সেই হিসাবে হয়তো তিনি গূঢ়তত্ত্বটা জানিলেও জানিতে পারেন এজন্য সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। শশাঙ্ক যেবার পাগল হয়, সেবারেও মেজদাই তাহার পরিচর্যা করিয়াছেন। তাই অনেকটা সমস্বরেই অনেকে বলিয়া উঠিল, কি ব্যাপার ?

জবাবের পূর্ব্বে বৃদ্ধেরা হয়তো একটা সাংসারিক কারণ খুঁজিলেন; কিন্তু ভাবিয়া দেখা গেল, বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধ মাতা কোন দিক

দিয়াই কোন আপদ বালাই নাই, অনাদরও নাই। আর্থিক অবস্থাও এমন অসচ্ছল নহে যে, মাথা খারাপ করিয়া দিতে পারে। যুবকেরা যৌনতত্ত্বে উৎসুক, কিন্তু সম্ভাবনার কোঠায় কোঠায় ঢুঁড়িয়া কিছু আবিষ্কার করা গেল না। স্ত্রী যেমন সুন্দরী, ফিতুবাবু তেমনই সুন্দর। কিশোর বালকেরা পাগল হইয়াছে এই তত্ত্ব জানিয়া বিস্মিত হইল, আর কিছু অনুমানও করিতে পারিল না।

মেজদা বলিলেন, ও যোগ করত।

যতীশবাবু বলিলেন, য়্যাঁ, যোগ?

মেজদা বলিলেন, হ্যাঁ। এক সাধু ওকে কিছুতেই শেখাবেন না, বার বার করে বলেছিলেন ঠিকমত না হ'লে মাথার বিকৃতি হতে পারে; তাই তো হ'ল।

একজন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ দেখিলেন, বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্রহ্ম জ্ঞান প্রমাণের এক মস্ত সুযোগ বহিয়া যায়। তিনি বলিলেন, তাই বটে, অধিকার ভেদে কাজ। ফিতু ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু যৌগিক প্রক্রিয়ায় সকলের অধিকার নেই। নিয়মাদি এমনি কঠোর, পতঞ্জল বলেছেন....। সমর্থনের জন্য একটি গল্পের অবতারণা করিতেই দেখা গেল, ফিতু বাবু স্বয়ং এদিকপানে ছুটিয়া আসিতেছেন। সকলেই নিঃশ্বাস নিরোধ করিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে তাঁহার উপস্থিতির মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। ফিতুবাবু আসিয়াই ডাকিতে লাগিলেন, এই, মনা, মনা, এদিকে আয়, শোন—

মনাবাবু আগাইয়া গিয়া বলিলেন, বাড়ী থেকে এলি কেন, চল, বলিয়া তাঁহাকে বাড়ীর দিকে আগাইতে নির্দেশ করিতেই ফিতুবাবু কুস্তির কায়দায় মনাবাবুকে এমন জড়াইয়া ধরিলেন যে, সেই কবল হইতে ছাড়াইয়া আনিতে একটা রীতিমত লড়াই সুরু হইয়া গেল। তখন আরও দুই একজন চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া একটা ঘরে ঢুকাইয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিল।

মনাবাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, ওরে বাপ, কি ভীষণ

জোর। সকলেই সায় দিয়া বলিল, পাগলের গায়ে অসীম জোর হয়।

প্রতুলের চোখে বারংবার সেই সুন্দর চেহারার রক্তাভা ও উদাস দৃষ্টি খেলিয়া যাইতে লাগি ।

এমন করিয়া জীবনের ষোলটা পরিচ্ছেদের অবসানে প্রতুল ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তাহার পরই অকস্মাৎ একটি চিন্তা প্রবলবেগে তাহাকে সোজা রাজপথ হইতে পথহীন এক ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিয়া দিল যেন। স্থির করিল, সে গতানুগতিক পথে যাইবে না, কলেজের সোজাপথে বিএ, এম-এ তাহার উদ্দিষ্ট পথ নহে বলিয়া মনে হইল। অন্য কোন লাইনে তাহার প্রতিভার পরীক্ষা করিতে হইবে। প্রস্তাবে সেজদার সমর্থন পাইয়া সে মনে বল পাইল। কিন্তু যাহারা মূলত এই প্রস্তাব অর্থবলে বা জ্যেষ্ঠত্বের দাবীতে সমর্থন করিবেন তাঁহারা ইহা সরাসরি অগ্রাহ্য করিলেন। অনেক অনুনয় আবেদন হইল; জ্যেষ্ঠ অভিভাবকেরা টলিলেন না। বিদেশে তাহারা কষ্ট স্বীকার করিবে, অভিভাবকদের কষ্ট লাঘবের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবে, তাহাও নিবেদন করিল। কাঁদিল, অভিমান করিল। পাষাণ দেবতাদের কাছে মাথা কুটিল। সাড়া যখন পাওয়াই গেল না তখন একদিন এক অতি সাধারণ প্রত্যুষে সেজদা ও প্রতুল ঘর ছাড়িল। স্থানান্তরে আর একবার মেজদার কাছে একই প্রার্থনা জানাইল। কোন ফল ফলিল না। প্রতুল একবার নিষ্ঠুর পৃথিবীর চারিদিক তাকাইয়া দেখিল, তাহার একমাত্র সঙ্গী তাহার নীরব সহোদর সেজদা ছাড়া আর কেহ তাহার পাশে নাই। নীরব, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আবার তাহারা ঘরের আশ্রয় ছাড়িল—একেবারে কপর্দ্দক শূন্যাবস্থায়।

নিতান্ত বাহির হইয়া যায় দেখিয়া মেজ বধূমাতা বলিলেন, ঠাকুর পো, এক মিনিট! বলিয়া অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে একহাতে

একটি টাকা ও আর একটি ছোট পুটুলি দুইজনের হাতে গুঁজিয়া দিয়া তেমনই তড়িৎবেগে অন্তরালে চলিয়া গেলেন।

কয়েক পা আগাইয়া প্রতুল কি মনে করিয়া যে-বাড়ী ছাড়িয়া যাইতেছে তাহার দিকে তাকাইল। দেখিল বৌদি চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বৌদির চোখে জল।

মুহূর্ত্তের দুর্বলতা কাটিয়া যাইতেই প্রতুল সম্মুখে সীমাহীন পথের দিকে তাকাইল। ঐ অসীম পথপ্রান্তরে বাবা নাই, মা নাই, বৌদি নাই, এই নির্দ্দয় হৃদয়ানুভূতিহীন শুষ্ক পৃথিবীতে কিছু নাই—কিছু দূরে তেমনই মাতৃপিতৃহীন সহোদর সেজদা অনাবিষ্কৃত রহস্যে মিশিয়া যাইতেছে। তাহাকেও সেদিকে অনিরুদ্ধ গতিতে চলিতে হইল।